বঙ্গীয় বৈশ্য।
(শ্রী প্রসন্নগোপাল কৃত।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আর্য্যজাতির প্রাচীন অবস্থা।

এই বিশাল বিশ্বের সমগ্র মানব-মণ্ডলী সমস্বরে 'আর্য্য' নামের গৌরব ঘোষণা করেন। মানব-জাতির ইতিহাসের অস্পষ্ট প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে এ পর্য্যন্ত, আর্য্যজাতির অসাধারণতা সমানভাবে উপলব্ধি করা যায়। ভারতীয় জাতি সেই বরণীয়—আর্য্যবংশসম্ভূত। ভারতের অল্পদিনের অতিথি, এবং মুসলমানধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বতন কালের পারশ্য-বাসী পার্শী-জাতিও আর্য্যকুলোৎপন্ন। প্রাচীন গ্রীক্, রোমক, ইংরেজ, জারমান্ প্রভৃতি জাতিও আর্য্যবংশোদ্ভূত।

'আর্য্য' শব্দ সংস্কৃত ঋ ধাতুর উত্তর ণ্যৎপ্রত্যয় যোগে সিদ্ধ। আর্য্য শব্দ সংস্কৃতে বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঋ ধাতুর আচরণ অর্থ গ্রহণ করিলে, আর্য্য শব্দে "অর্ত্তুং আচরিতুং (সদাচরিতুং) যোগ্যঃ" অর্থাৎ সদাচারক্ষম বুঝায়। হেমচন্দ্র বিরচিত অভিধানচিন্তামণিতে 'আর্য্য' বুদ্ধদেবের নামান্তর—লিখিত আছে। আর্য্য শব্দে স্বামী বুঝায়। অজয় বলেন, আর্য্য অর্থ সুহৃৎ। আর্য্য শব্দে ম্লেচ্ছেতর শ্রেষ্ঠ জাতি বুঝা যাইতে পারে।

মহাভারতে "ম্লেচ্ছাশ্চান্যে বহুবিধাঃ পূর্ব্বং যে নিকৃতা রণে। আর্য্যাশ্চ পৃথিবীপালাঃ *" ইত্যাদি শ্লোকে আর্য্য শব্দে ম্লেচ্ছেতর শ্রেষ্ঠ জাতি প্রতিপাদিত হইয়াছে। হরিবংশে দেখিতে পাওয়া যায়, সাবর্ণি-মনুর দশ পুত্রের মধ্যে একজনের নাম আর্য্য। কোনও পণ্ডিতের অভিপ্রায়—এই 'আর্য্য' মহোদয়ের বংশই আর্য্যবংশ। হরিবংশের শ্লোকটী এই—"বরীয়াংশ্চাবরীয়াংশ্চ

সংযতো ধৃতিমান্ বসুঃ। চরিষ্ণুরার্য্যো ধৃষ্ণুশ্চ রাজঃ সুমতি-রেবচ।” এই শ্লোকে মনুর দশপুত্রের দশটী নাম প্রদর্শিত হইয়াছে। মনুর অপত্য মানব, সুতরাং মানবের পিতাই মনু। মানবের পিতার দশপুত্র, অর্থাৎ মানব দশবিধ, এইরূপ বুঝা যায়। দশবিধ মানব জাতির মধ্যে এক সম্প্রদায়ের নাম আর্য্য। জগতে দশবিধ জাতির বিদ্যমানতা একান্ত অসম্ভব নহে। আর্য্য ব্যতীত নয় প্রকার জাতি অতি প্রাচীন-কালে থাকিতেও পারে। তাহাদের মধ্যে কেহ ভ্রমণকারী জাতি, তাহার নাম চরিষ্ণু। অপর অবরীয়ান্ বা নীচ। এই নব জাতিমধ্যে আর্য্য-গুণসম্পন্ন অথচ আর্য্যবংশজ ভিন্ন অন্য জাতি, ‘ বরীয়ান্ ’ নামেও অভিহিত হইতে পারে। এইরূপ বিভাগ, পৌরাণিক রূপকে মনু প্রভৃতির ভিন্ন ব্যাখ্যা করায় অনেকটা অজ্ঞেয় হইয়া উঠিলেও, হরিবংশে অজ্ঞাত-সারে তাহার অনুস্মৃতি আসিতেছিল, এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। হরিবংশীয় প্রমাণে আমরা অবগত হইলাম, আর্য্য এক শ্রেণীর মানব। ‘ শ্রেষ্ঠত্ব ’ ‘ স্বামিত্ব ’ প্রভৃতি আর্য্যপদপ্রয়োগের হেতু গুলি উন্নয়ন এবং আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য সমাজে উপস্থিত হইয়াছে, অনুমান করা যায়। সাধারণতঃ আধুনিক অভিধানে আর্য্য শব্দের অর্থ পূজ্য, শ্রেষ্ঠ ও অধিপতি, এবং উৎকৃষ্ট, ন্যায়ানুগত ইত্যাদি—দেখা যায়। ভারতের সর্ব্বজ্ঞানপ্রসূতি বেদশাস্ত্রে আর্য্য শব্দের ভূরিপ্রয়োগ পরি-দৃষ্ট হয়। তথায় শ্বেতকায় যজ্ঞকারী জাতিকেই আর্য্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

সর্ব্ব প্রথমে আমরা দশসহস্রাধিক মন্ত্রপূর্ণ সহস্রাধিক সূক্তযুক্ত ঋগ্বেদের কিঞ্চিৎ চর্চ্চা করিব। এই গ্রন্থ সমস্ত সভ্যজাতির গ্রন্থ-রচনার পূর্ব্বে প্রণীত। গ্রন্থজগতের সার্ব্বভৌম সম্রাট্‌রূপে ইহার নামোল্লেখ করিতে কেহই কুণ্ঠিত নহেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল ১০৩ সূক্তে আর্য্য শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। পরে “বিজানীহি আর্য্যান্ যে চ দস্যবঃ” অর্থাৎ আর্য্য ও দস্যুদিগের পৃথগ্ ভাবে অবগত হও, ইত্যাদি মন্ত্রে ‘আর্য্য’ পদপ্রয়োগ দেখা যায়। দশমমণ্ডলে ৮৬ সূক্তে “বিচি-ন্বান্ দাসমার্য্যং” অর্থাৎ আমি দাসও আর্য্যদিগকে পৃথক্‌রূপে অবগত

হইয়াছিলাম, এই মন্ত্রে আর্য্য শব্দ পাওয়া যায়। আর ও এক স্থানে দেখা যায় "হত্বা দস্যূন্ প্রার্য্যং বর্ণমাবৎ" ইন্দ্র দস্যুদল বিনাশ পূর্ব্বক আর্য্যবর্ণ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানে যে আর্য্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অনার্য্যবিরোধী দেব-সেবক জাতির নাম। ভারতবর্ষে সুদীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া, এতদ্দেশের আদিম অধিবাসী অনার্য্য কৃষ্ণকায় দাস, অসুর, দস্যু রক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি নামধারী অসভ্য জাতিদিগের সহিত শ্বেতকায় আর্য্য-নামক আগন্তুক জাতির যে প্রবল বিবাদযুদ্ধাদি সংঘটিত হইয়াছিল, ঋগ্বেদের বহুস্থানে তাহার প্রকৃষ্ট বিস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডল ১০৫ সূক্তে "দস্যূন্ শিম্যূন্ চ পুরুহূত এবৈর্হত্বা পৃথিব্যাং সর্ব্বাণি বর্হীঃসনৎ ক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্র্যেভিঃ সনৎসূর্য্যং সনদপঃ সুবজ্রঃ" এই মন্ত্রটী দেখা যায়। ইহার অর্থ, ইন্দ্র বহুদ্বারা আহূত হইয়া, ও গমনশীল মরুদ্‌গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, পৃথিবীবাসী দস্যু এবং শিম্যুদিগকে বজ্রদ্বারা হত করিলেন, পরে আপন শ্বেতবর্ণ মিত্রদিগের সহিত ক্ষেত্রসকল ভাগ করিয়া লইলেন। শোভন বজ্রধর ইন্দ্র, সূর্য্য এবং জল প্রাপ্ত হইলেন। আর্য্যগণ কর্ত্তৃক আহূত ইন্দ্র দস্যুদিগকে বিনাশ করিয়া শ্বেতবর্ণ আর্য্যমিত্রগণের সহিত শস্যক্ষেত্র ভাগ করিয়া লইতেছেন, আর্য্য-অনার্য্য-সংগ্রামের ইহা সুস্পষ্ট পরিচয়। প্রথম মণ্ডলে ১০১ সূক্তে ইন্দ্র 'কৃষ্ণ' নামক অসুরকে বিনাশ করিয়া, তাহার গর্ভবতী স্ত্রী হরণ করেন, এরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। ১০৩ সূক্তে ইন্দ্রকর্ত্তৃক দস্যুগণের নগর বিধ্বস্ত হইবার উল্লেখ আছে। এই বিসম্বাদসময়ে দুই জাতির প্রধানতঃ উল্লেখ, আর্য্য ও অনার্য্য। ১০৫ সূক্তে "শ্বিত্র্যেভিঃ" শব্দে আর্য্যগণের শ্বেতবর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই আর্য্যগণ সুনস এবং পক্কমাংসাশী ছিলেন, ইহারও অনেক স্থলে নিদর্শন আছে। অনার্য্যগণ কৃষ্ণকায় ছিল, তাহার প্রমাণ—৪র্থ মণ্ডলের ১৬ সূক্তের "পঞ্চাশৎ কৃষ্ণ কৃষ্ণনিবপঃ" ইত্যাদি মন্ত্র। অনার্য্যগণ আমমাংসাশী ছাগনাসিকাবিশিষ্ট, নীচ, কুদৃশ্য, অধর্ম্মপরায়ণ ইত্যাদি বর্ণনাও নানা স্থানে আছে। আর্য্যগণের মধ্যে কোনও দল কখন ও বা অনার্য্যসঙ্গে মিত্রতা করিয়া, আর্য্যদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত

হইতেন, ইহারও প্রমাণ আছে। যথা—'দাসস্য বা মধুবানার্য্যস্য সমুতা যবয় বাধং' অর্থাৎ দাসের ও আর্য্যের অস্ত্র বিমুখ কর। দশম মণ্ডলে আছে, "সহ্যেম দাসমার্য্যং ত্বয়া যুগা" তোমার সাহায্যে যেন দাস ও আর্য্যের আক্রমণ সহ্য করিতে পারি। আরও দেখা যায় "ত্বং তান্ ইন্দ্র উভয়ান্ অমিত্রান্ দাসান্, বৃত্রাণি আর্য্যা চ শূর বধীঃ" হে ইন্দ্র! তুমি দাস ও আর্য্যবৃত্র, আমাদের এই উভয় শত্রুই বিনাশ করিয়াছিলে। দশম মণ্ডলের ৩৮ সূক্তে দৃষ্ট হয়—"যোনঃ দাস্যঃ আর্য্যো বা পুরুষ্টুত অদেবা ইন্দ্র! যুদ্ধায় চিকেতাতি" অর্থাৎ যে কোনও দাস এবং অদেব আর্য্য আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে; এরূপ বহু প্রমাণে বুঝিতে পারি, আর্য্য একটী শ্বেতবর্ণ জাতির নাম।

যজুর্ব্বেদে দেখিতে পাই—"যচ্ছূদ্রে যদার্য্যে যদেনস চকৃমা বয়ং" অর্থাৎ আমরা শূদ্র ও আর্য্যের বিরুদ্ধে যে পাপ করিয়াছি। এখানেও অনার্য্য বা শূদ্র ব্যতীত অন্য এক জাতিই আর্য্যনামধারী প্রতিপন্ন হয়। এই জাতির বল-বুদ্ধি, বিদ্যাগৌরব যখন জগতের সম্মুখে দেদীপ্যমান হইতেছিল, তখনই "কর্ত্তব্য মাচরন্ কামমকর্ত্তব্য মনাচরন্। তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বা আর্য্য ইতি স্মৃতঃ" অর্থাৎ কর্ত্তব্যপরায়ণ অকর্ত্তব্যবর্জ্জিত প্রকৃতাচারস্থ ব্যক্তিই আর্য্য—ইত্যাকার লক্ষণের সূচনা হইল।

ঋ ধাতুর অর্থ পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞগণের মতে 'কর্ষণ'। হলযোগে কৃষিকারী প্রাচীন সম্প্রদায়কে এই অর্থেও আর্য্য বলা যাইতে পারে। আর একটী শব্দ অর্য্য। উহাও ঋ ধাতু হইতে যৎ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। শুক্ল যজুর্ব্বেদে ঐ শব্দ প্রথম দৃষ্ট হয়। সেখানে তাহার অর্থ বৈশ্য। লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনিব্যাকরণমতেও অর্য্য অর্থ বৈশ্য। বার্ত্তিককারের মতে বৈশ্যবোধক অর্য্য শব্দের অকার উদাত্ত হইয়া, আর্য্য উচ্চারিত হইবে। ইহাতে অনুমিত হয়,—অর্য্য এবং আর্য্য মূলত একই শব্দ। অর্য্য শব্দেরও অর্থ অভিধানে আর্য্য শব্দের ন্যায়। স্বামী, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, ন্যায্য ও বৈশ্য ইত্যাদি অর্থে 'অর্য্য' শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। মনে হয়, সর্ব্ব প্রথমে জাতিভেদ ঘটনার পূর্ব্বতন কালে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদি সংজ্ঞায় গ্রথিত হইবার আগে, সকলকেই অর্য্য

বা আর্য্য বলা হইত। পরে বর্ণভেদসৃষ্টির পরবর্ত্তী সময়ে কর্ষণকারী বৈশ্যজাতিকে কখনও বা 'অর্য্য', কভু বা 'আর্য্য' বলা হইত। উত্তরোত্তর শব্দার্থবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠ, স্বামী, সুহৃৎ 'আর্য্য' হইলেন, এবং স্বামী আর বৈশ্য 'অর্য্য' রহিলেন। অপেক্ষাকৃত নবীন গ্রন্থে অর্য্য অর্থে স্বামী এবং বৈশ্য, আর্য্য শব্দের অর্থ পূজ্য শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি দেখিতে পাই। কেহ বা ঋ ধাতু হইতে, কেহবা ইরাশব্দমূলক কল্পিত ভূমার্থক 'অর' শব্দ হইতে আর্য্য শব্দের উৎপত্তি বলেন, কিন্তু সংস্কৃতে 'ইরা' অর্থ ভূমি থাকিলেও 'অর' অর্থ কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেখা বা পদ্মাদির দল। অর শব্দের অন্য অর্থ পথ। অর অর্থ ভূমি, আর্য্য অর্থ কৃষিব্যবসায়ী বা ভূমিবসায়ী বা ভূমি হইতে জাত ইত্যাদি—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যৌক্তিক কল্পনা।

বিশ্ শব্দের সংস্কৃতে অর্থ গৃহ ও লোক। একই শব্দ গৃহ এবং গৃহবাসী এই উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। বেদে 'ক্ষিতি' অর্থ বাসস্থান ও বাসকারী, কৃষি অর্থে কর্ষণ এবং কর্ষণকারী বুঝায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, সংস্কৃতে 'অর' শব্দে ভূমি বুঝাইলে, গো হইতে গব্য শব্দের ন্যায় অর হইতে আর্য্য শব্দ উৎপন্ন হইতে পারিত। বর্ত্তমান সংস্কৃতে ভূমার্থক অর শব্দ না থাকিলেও পূর্ব্বে ছিল, অনুমান করা হয়। গ্রীক্ লাটিন্ প্রভৃতি সংস্কৃতের সমজাতীয় ভাষায় অর ধাতু কর্ষণার্থ বুঝায়। ইংরেজী ভূমিবাচক আরৎ শব্দ অর ধাতু হইতে উৎপন্ন। যাহা কর্ষণ করা যায়, তাহাই আরৎ বা ভূমি। সংস্কৃতে অর না থাকিলেও, হা'ল অর্থে অরিত্র শব্দ আছে। হল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করা হয়, হা'ল দ্বারা সমুদ্র কর্ষণ করা যায়। এই সকল দর্শনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ 'অর' শব্দ বা ঋ-ধাতু-মূলক আর্য্য শব্দের অর্থ—'কর্ষক' এইরূপ নির্দ্দেশ করেন। এ কল্পনা সঙ্গত হইলে, তাহাতে আমাদের সেই প্রাচীন জাতিই আর্য্য নামের লক্ষ্য হয়।

পার্শীদিগের প্রাচীন গ্রন্থ 'জেন্দ্ অবেস্তা'য় অনার্য্য শব্দ আছে। পারস্য ভাষায় আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই শব্দই পাওয়া যায়। উহার সেখানে পূজ্য, শ্রেষ্ঠ, সদ্বংশজ ইত্যাদি অর্থই গৃহীত হয়।

রাজা ডেরায়স আপনাকে আর্য্যচিত্র বা আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতেন। কালবশে আর্য্যস্থানে ইরান্ এবং অনার্য্যস্থানে অনিরান্ হইয়াছিল। গ্রীক্ প্রাচীন ভৌগোলিক দক্ষিণে ভারতসিন্ধু, পূর্ব্বে সিন্ধুনদ, উত্তরে হিন্দুকুশ ইত্যাদি, পশ্চিমে পারশ্য উপসাগর—এই চতুঃসীমাবর্ত্তী স্থানকে 'আর্য্যানা' বলিতেন। প্রাচীন আর্য্যজাতির সকল শাখাই প্রথমে একত্র বসবাস করিতেন, পরে ইউরোপবাসিবৃন্দ বিচ্ছিন্ন হইলেও হিন্দু এবং পার্শীজাতি বহুদিন সম্মিলিত ছিলেন। শেষে দেবতা ও অসুরপূজা লইয়া মতভেদ সংঘটিত হওয়ায়, আর্য্য পার্শী জাতি পারশ্যে গমন করেন। তথায় মুসলমান আক্রমণ পর্য্যন্ত স্বভাবে ছিলেন, শেষে কেহ বা মুসলমান্ ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে থাকেন, কেহ বা স্বধর্ম্ম লইয়া ভারতে আসিয়া বাস করেন।

আর্য্য জাতির আদিম বাসস্থান লইয়া নানারূপ কল্পনা জল্পনা বিবাদ বিসম্বাদ মতভেদ সাহিত্যসংসার মুখরিত করিতেছে। আমরা সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব। এক সম্প্রদায় পণ্ডিতের মতে, এই ভারতবর্ষই আর্য্যগণের আদিম বাসস্থান। আর্য্যগণ ভারতবর্ষের আগন্তুক অতিথি নহেন। মনুসংহিতায় আছে "আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাৎ আসমুদ্রাচ্চ পশ্চিমাৎ। তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ। এখানকার 'তয়োঃ' কথাটীর অর্থ—হিমবদ্ বিন্ধ্যয়োঃ। শ্লোকের অর্থ এই যে, পূর্ব্বে পূর্ব্বসমুদ্র পশ্চিমে পশ্চিম সাগর, উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল—এই চতুঃসীমান্তর্গত স্থানের নাম আর্য্যাবর্ত্ত। আর্য্যাঃ আবর্ত্তন্তে নিবসন্তি অত্র, আর্য্যগণ এখানে বাস করেন, ইহাই আর্য্যাবর্ত্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি। অমরসিংহ লিখিয়াছেন "আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমিঃ মধ্যে বিন্ধ্যহিমাগয়োঃ"। বিন্ধ্য এবং হিমাচলের মধ্যভূভাগ আর্য্যাবর্ত্ত। এই আর্য্যাবর্ত্ত নাম আর্য্যগণের বাসভূমির পরিচয় স্বরূপ বটে, কিন্তু আদিম বাসস্থান সূচক নহে, ইহাই অনেক প্রধান পণ্ডিতের মত। আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিবার বহুপূর্ব্বে, আর্য্যজাতি ভারতের বাহিরে অবস্থিতি করিতেন।

কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে বাল্টীক্ সাগরের তীরবর্ত্তী ভূবিভাগই আর্য্যগণের আদিস্থান। এমত সাধারণ্যে সমাদৃত নহে। কারণ

যদি সমুদ্রতীর আর্য্যগণের আদিমস্থান হইত, তবে আর্য্যভাষাসমূহে সমুদ্র সম্বন্ধীয় বহুসংখ্যক সাধারণশব্দ পাওয়া সম্ভব হইত। পশুদিগের বা পক্ষীদিগের সাধারণ নাম এই সকল ভাষায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, আর্য্যগণ সমুদ্রতীর হইতে আগমন করেন নাই। অধিকাংশ ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে মধ্য এসিয়াই আর্য্যগণের আদিস্থান। তথা হইতে এক দল দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে, অপর একদল উত্তরপশ্চিম দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। প্রথমোক্ত দল ভারতে এবং পরবর্ত্তী দল ইউরোপে গিয়াছিলেন। এইরূপ নির্দ্দেশের কয়টী কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ, দক্ষিণপূর্ব্ব এবং উত্তরপশ্চিমে আর্য্য জাতির দুইটী প্রবাহ দেখা যায়, এই প্রবাহের সংযোগ স্থলে এসিয়া মহাদেশ। দ্বিতীয় কারণ প্রাচীন সভ্যতম দেশসমূহ এসিয়া খণ্ডের অন্তর্গত। আর্য্যভাষা সমূহের মধ্যে ঋগ্বেদের ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সুতরাং এসিয়া খণ্ডের মধ্যে ঋগ্বেদের জন্মস্থান পঞ্জাব প্রদেশের অনতিদূরেই আদিম আর্য্যস্থান হওয়া সুসঙ্গত। তৃতীয় কারণ—"অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের মধ্যে এসিয়া হইতে সমুদ্ভূত অনেক প্রবলপরাক্রান্ত জাতি ইউরোপখণ্ডে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, ইতিহাসে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।" দৃষ্টান্তস্বরূপে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর হূনজাতি এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোগল জাতির উল্লেখ করা যাইতে পারে, আধুনিক সময়ের তুলনায় বলা যাইতে পারে, প্রাচীনকালেও মধ্য এসিয়া হইতে যাইয়া, আর্য্যসন্ততিগণ ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। এই মত অধুনাতন ইউরোপীয় সমাজে অত্যধিক আদৃত।

সম্প্রতি একজন ভারতীয় পণ্ডিত আর্য্যজাতির আদিগৃহ সম্বন্ধে অভিনব সুন্দর সুযুক্তিপূর্ণ বহুগবেষণাময় মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার সিদ্ধান্ত জনসমাজে অল্পকাল প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি বলেন "উত্তরমেরুর সন্নিহিতস্থানে প্রাচীন আর্য্যজাতি বাস করিতেন।" খৃষ্টের জন্মের অষ্টসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে, চিরতুষারময় উত্তরমেরুপ্রদেশ যে বর্ত্তমান অবস্থায় অবস্থিত ছিলনা,—তথায় শীতাতপসামঞ্জস্য এবং মনুষ্যবাসের উপযোগিতা ছিল,

তাহা পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের সাহায্যে তিনি সুদৃঢ়রূপে প্রমাণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ইত্যাদি গ্রন্থের সহায়তায় তিনি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বেদে ছয়মাসব্যাপী অতিদীর্ঘ দিবা ও রজনীর বর্ণনা আছে। ইহা উত্তরমেরুর সন্নিকৃষ্ট স্থানে বাসের পরিচয়। মেরুর নিকটবর্ত্তী স্থানে ব্যতীত অন্যত্র ছয়মাসব্যাপী দিন-রাত্রি অসম্ভব। মেরুদেশ পরিত্যাগের পরে, বেদরচনার সময়েও ঐ স্মৃতি থাকা সুসম্ভব। বেদে "অতিরাত্র" নামক একটী যজ্ঞেরও উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারেরা অতিদীর্ঘরাত্রির কথা জানিতেন না, সুতরাং রচয়িতাদের ছয়মাসব্যাপী দীর্ঘরাত্রিকে তাঁহারা অন্য অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। মস্তকোপরি বিপরিবর্ত্তমান সপ্তর্ষি-মণ্ডলের কথা বেদে আছে। মধ্য এসিয়া বা অন্য কোনও স্থানের লোকের মস্তকোপরি সপ্তর্ষিমণ্ডল ভ্রমণ করিতে পারেনা। কেবল উত্তরমেরু-সন্নিহিত স্থাননিবাসীর মাথার উপর সম্ভব। ইহাও উত্তরমেরু প্রদেশে বসবাসের স্মারক কারণ। বেদে আরও আছে, সূর্য্য চন্দ্রাদির অভাবে আলোকিত হওয়ার কথা। একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে, ছয়মাসব্যাপী সুদীর্ঘ রজনীতে "অরোরা বোরিয়ালিস্" নামক সুদীপ্ত আলোকে সূর্য্যচন্দ্রপ্রভাবিহীন মেরুপ্রদেশ আলোকিত থাকে। মেরুর নিকটে এই আলোক লাভ করা যায়, অন্যত্র অসম্ভব। এ উল্লেখও মেরুপ্রদেশবাসের অনুস্মৃতি মাত্র।

এই মতপ্রচারক মহোদয় সম্প্রতি একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের মুখ্যতম যুক্তিগুলির এ প্রবন্ধে স্থানসমাবেশ অসম্ভব, সুতরাং আমরা সংক্ষেপে পরিচয় মাত্র দিয়া নিরস্ত হইলাম। আর্য্য-জাতির আদিস্থান যাহাই হউক, তথা হইতে এক সম্প্রদায় ইউরোপে এবং অন্য সম্প্রদায় ভারতে আসিয়াছিলেন, ইহা অবধারিত। ভাষাবিজ্ঞানের সহায়তায় আমরা ইউরোপযাত্রী আর্য্যগণের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হই। সর্ব্বপ্রথমে আমরা দেখিতে পাই, জগতের যাবদীয় ভাষাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তাহাদের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়াই এরূপ বিভাগে সম্মতি প্রদান করা হয়। প্রথম আমরা এক শ্রেণীর ভাষা

দেখিতে পাই, যাহাতে বিভক্তির সাক্ষাৎ নাই, ধাতুর সঙ্গে সংযোগ-
মাত্র দ্বারা, বাক্যের গঠন নিষ্পন্ন হয়, কোনও ধাতুর কোন প্রকার
রূপান্তর হয় না। এই ভাষাকে "সংযোগাসাপেক্ষ ভাষা" কহা যায়।
চীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়
অন্য শ্রেণীর ভাষাতেও বিভক্তি নাই, কিন্তু উপসর্গ ও প্রত্যয়াদি ধাতু-
দ্বারা রূপান্তরিত হয়। এই ভাষায় ধাতুতে ধাতুতে, বা ধাতুতে সর্ব্ব-
নামে একপ্রকার যোগ সংঘটিত হয়। এই ভাষার নাম "সংযোগসাপেক্ষ"
ভাষা। তামিল ভাষা, তাতার ভাষা বা আমেরিকার আদিম অধিবাসি-
দের ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাতে প্রকৃষ্টরূপ
বিভক্তি আছে। এই ভাষায় সংযোগস্থলে ধাতুর ও সর্ব্বনামের রূপা-
ন্তর ঘটে। ইহাদিগকে "বিভক্তিযুক্ত ভাষা" বলা যাইতে পারে। পৃথি-
বীর বড় শ্রেষ্ঠ ভাষা, সকলেই এই শ্রেণীর। এই ভাষার নাম "ককেশীয় ভাষা
বা আর্য্যভাষা"। গ্রীক্, লাটিন্, জারমেন্, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, সংস্কৃত, বাঙ্গালা,
হিন্দী প্রভৃতি ভাষাগুলি এই শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। দেশ ও জাতি-
ভেদে এই সকল ভাষার শব্দসম্ভারের বহুল ব্যত্যয় সংসাধিত হইলে,
ও ইহারা বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া, বহুপ্রকার স্বতন্ত্রতালাভ করিলেও, এই
সকল ভাষা যে মূলে একই, তাহা ভাষাবিজ্ঞানের সহায়তায় সম্পূর্ণ-
রূপে প্রমাণিত হইতে পারিয়াছে। এই শ্রেণীর ভাষাগুলির মধ্যে,
অনেক আধুনিক এবং প্রাচীন ভাষার মূলগত ধাতু, বিভক্তি, চিহ্ন,
ও সর্ব্বনাম অনেক স্থলে একই আছে। আর্য্যভাষা যে যে জাতির
নিজস্ব, তাহারা সকলে নিশ্চয় আর্য্যবংশসম্ভূত। এ পুস্তকে ভারতীয়
আর্য্যগণের কথাই আমরা বলিব।

আদিস্থান হইতে আর্য্যজাতির যে শাখা—ভারতবর্ষে আগমন করেন,
তাঁহারা প্রথমে পঞ্জাব প্রদেশে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। পঞ্জাব প্রদেশের
তখনকার নাম ছিল "সপ্তসিন্ধু"। এই প্রদেশে বাসের সময়ে ধর্ম্মমতের
বিরোধ সংঘটন হওয়ায়—অসুরোপাসক ইরাণীয় জাতি (পার্শী জাতি)
পারস্যে গমন করেন। যাঁহারা পঞ্জাবে রহিলেন, তাঁহারা ক্রমশঃ সিন্ধু ও
তাহার পঞ্চশাখাতীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন।

এতদ্দেশের আদিম অধিবাসী 'অনার্য্য'-নামক কৃষ্ণকায় জাতির সহিত নবীন-উদ্যমে অসীম-বলে অদম্য-উৎসাহে তাঁহারা সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মার্ত্তণ্ডপ্রভার নিকট প্রদীপের আলোক সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। আদিম অনার্য্যগণ আর্য্যদিগের বাহুবলে বিধ্বস্ত পরাজিত হইল। তাহারা দলে দলে আর্য্যজাতির আনুগত্য অঙ্গীকার করিয়া, আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা অনভ্যস্ত অধীনতার আশঙ্কায় জন্মভূমিজননীর চরণে চির-দিনের জন্য প্রণাম করিয়া, গভীর অরণ্যে, পর্ব্বতকন্দরে—সুদূরপ্রান্তরে পলায়ন করিল। সুযোগমত প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির উত্তেজনায়, তাহারা অতর্কিতভাবে আর্য্যগণের গোবৎসাদি অপহরণ করিত, এবং অনিশ্চিত-আক্রমণে আর্য্যগণের অধিকৃত স্থানে অশান্তির অনল জ্বালাইয়া দিত। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৪ সূক্তে এই সকল অতর্কিত উপদ্রবের আশ-ঙ্কায়, তাহাদের বিনাশকামনায়, আর্য্যগণ অগ্নিদেবের স্তুতি করিতেছেন—দেখা যায়। বস্তুতঃ পরিণামে বিবাদবিসম্বাদের শেষে, আর্য্যগণই জয়লক্ষ্মীর বরমাল্য গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

অবিশ্রান্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া, তাঁহারা অল্পকালে ব্রহ্মর্ষি বা গাঙ্গ্য প্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। গাঙ্গ্যপ্রদেশে বসবাসের সূত্রপাত হইতেই দলেদলে আর্য্যগণ নানাস্থান হইতে সমাগত হইয়া দোয়াব প্রদেশে বসতি করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালেও আর্য্যগণের মধ্যে সম্প্রদায়সৃষ্টি হয় নাই। কেবল বিজিত এবং বিজেতার পার্থক্য, শ্বেতকৃষ্ণপ্রভেদ—আর্য্য-অনার্য্যভেদ—প্রভুদাস-পার্থক্য মাত্র তখন-কার আর্য্যসমাজে বিদ্যমান ছিল। তৎকালীন আর্য্যসমাজ অনার্য্য-দিগের ন্যায় অসভ্য ছিলেন না। তাঁহাদের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি সমস্তই অনার্য্যগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। তাঁহারা কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ এবং সামাজিক উন্নতি সংসাধন করিতেন। তখন কোনও ব্যবসায় বংশগত হইয়া, একটী স্বতন্ত্রসম্প্রদায় বা জাতি সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

আর্য্যগণ প্রধানতঃ কৃষিব্যবসায়ী ছিলেন। এই ভারতের অত্যুর্ব্বর ভূমিখণ্ড, প্রকৃতির প্রসাদে, তাঁহাদের তৎকার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল।

তাঁহারা অত্যধিক আনন্দের সহিত আপনাদিগকে 'আর্য্য' বা কর্ষক বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহারা বস্ত্রবয়নাদিপ্রথা অবগত ছিলেন, এবং নিজেরা রম্যপট্টবস্ত্র পরিধান করিতেন। তাঁহারা পর্ণ, কাষ্ঠ এবং মৃত্তিকা ও প্রস্তর ইত্যাদির দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ করিতেন। গৃহনির্ম্মাণনৈপুণ্যে আপনাদের সুখ-শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন। স্বর্ণ, তাম্র, রৌপ্য, লৌহ, ইত্যাদি ধাতুদ্রব্যের ব্যবহারে তাঁহারা অভিজ্ঞ ছিলেন। অলঙ্কারনির্ম্মাণ-প্রণালীতে অভিজ্ঞতা, এবং শোভাসৌন্দর্য্যের বহুজ্ঞতায় তাঁহারা ধনী ছিলেন। তাঁহারা গণিত, জ্যোতিষ, সাহিত্য, শিল্প, কৃষি, ধর্ম্ম ও অর্থনীতি, উপাসনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় পারদর্শী ছিলেন। স্নান, দন্তধাবন, আহার, শয়ন, ভ্রমণ, উপগমন ইত্যাদি স্বাস্থ্যসম্বন্ধ নীতিবর্গের আলোচনায় তাঁহারা নিপুণ ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা এবং ন্যায়ানুগত সংযত স্ত্রী-স্বাধীনতা—তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাঁহারা সরলধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্ত্তীকালের ন্যায় আড়ম্বর-প্রিয়তা না থাকিলেও, ধর্ম্মের প্রাণ বিশ্বাসরত্নে তাঁহারা অত্যধিক সৌভাগ্য-শালী ছিলেন। পরবর্ত্তীকালের ন্যায় দেবদেবীর পূজা তাঁহাদের মধ্যে ছিল—মনে হয় না। তাঁহারা স্বভাবতঃ প্রকৃতিপূজক ছিলেন, বুঝা যায়। চন্দ্র, সূর্য, মেঘ, বজ্র, ঊষা, সন্ধ্যা ইত্যাদির উপাসনা—তাঁহাদের মধ্যে আচরিত হইত। যাজন, যুদ্ধ, পশুপালন ভূমিকর্ষণ ইত্যাদি—তখনও কাহারও নিজস্বরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। যিনি শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া ধন প্রাণ মান রক্ষা করিতেন, গৃহে ফিরিয়া তিনিই আবার সুন্দর ঋক্ মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রের উপাসনা করিতেন। সময়ে তিনিই স্বহস্তে হলদ্বারা ক্ষেত্রকর্ষণ এবং পশুপালন করিতেন। রাজশক্তি বা পৌরোহিত্য দ্বারা, তখনও জাতি-বিশেষের সৃষ্টি হয় নাই। আর্য্যগণ তখন ই নানাবিষয়ে উন্নত ছিলেন।

আমরা তাঁহাদের কৃষি ও বাণিজ্য-বিষয়ক কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া এ পরিচ্ছেদ সমাপন করিব। ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ৫৭সূক্তে দেখা যায়—

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতেনেব জয়ামসি। গামশ্বং পোষয়িত্ন্বা সনো মৃলাতীদৃশে। ১

ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্ম্মিং। ধেনুরিব পয়োঽস্মাসু ধুক্ষ্ব।
মধুশ্চ্যুতং ঘৃতমিব সুপূতমৃতস্য নঃ পতয়ো মৃলয়ন্তু ॥ ২

মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো, মধুমন্নো ভবত্বন্তরিক্ষং।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্নো অস্ত্বরিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম॥৩
শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলং। শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং
শুনমষ্ট্রামুদিঙ্গয়॥৪
শুনাসীরাবিমং বাচং জুষেথাং যদ্দিবি চক্রথুঃ পয়ঃ। তেনেমামুপসিঞ্চতং॥৫
অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা, যথানঃ সুভগাসসি যথানঃ সুফলাসসি॥৬
ইন্দ্রঃ সীতাং নিগৃহ্ণাতু তাং পূষাভিরক্ষতু। সানঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং
সমাং॥৭
শুনং নঃ ফালা বিকৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অভিযন্তু বাহৈঃ—
শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তং॥৮

এই মন্ত্রসকলের অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে যথা,—

মিত্ররূপ ক্ষেত্রপতির সহিত আমরা ক্ষেত্র জয় করিব। তিনি আমাদিগের গো অশ্ব প্রভৃতির পুষ্টি সাধন করুন। তিনি এই দান করিয়া আমাদিগকে সুখভোগী করুন।১

হে ক্ষেত্রপতি! ধেনু যেরূপ দুগ্ধ দান করে, সেইরূপ মধুস্রাবী সুপূত ঘৃতসদৃশ মধুরিমপূর্ণ প্রচুর জল প্রদান কর। এই যজ্ঞের অধিপতিরা আমাদিগকে সুখী করুন।২

ওষধিসকল আমাদের জন্য মধুময় হউক, দ্যুলোক, জলসমূহ ও অন্তরীক্ষ মধুময় হউক, এবং ক্ষেত্রপতি মধুদায়ক হউন। আমরা অহিংসিত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিব।৩

বলীবর্দ্দগণ সুখে বহন করুক, নরগণ সুখে কার্য্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক, প্রগ্রহসকল সুখে বদ্ধ হউক এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর।৪

হে শুন! হে সীর! তোমরা আমাদিগের এই স্তোত্র গ্রহণ কর। তোমরা দ্যুলোকে যে জল সৃষ্টি করিয়াছ, তদ্দ্বারা পৃথিবী সিক্ত কর।৫

হে সৌভাগ্যশালিনী সীতা! তুমি অগ্রবর্ত্তিনী হও, আমরা তোমার বন্দনা করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন এবং সুফল প্রদান কর।৬

ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন্, পূষা তাহাকে পরিচালিত করুন্, তিনি জলময়ী হইয়া বর্ষে বর্ষে শস্য দোহন করুন ৭

ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক্, রক্ষকগণ বলীবর্দ্দের সহিত সুখে গমন করুক্, পর্জ্জন্য মধুর জলদ্বারা পৃথিবীকে সিক্ত করুন্। হে শুন! হে সীর! আমাদিগকে সুখ প্রদান কর ৮

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডলের ১০১ সূক্ত পাঠ করিলে কৃষি সম্বন্ধে আরও উল্লেখ দৃষ্ট হইবে।

যুনক্ত সীরা বিযুগা তনুধ্বং কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজং।
গিরা চ শ্রুষ্টিঃ সভরা অসন্নো নেদীয় ইৎসৃণ্যঃ পক্বমেয়াৎ ॥৩
সীরা যুঞ্জন্তি কবয়ো যুগা বিতন্বতে পৃথক্‌, ধীরা দেবেষু সুম্নয়া ॥৪

নিরাহাবান্‌ কৃণোতন সংবরত্রা দধাতন, সিঞ্চামহা অবতমুদ্রিণং বয়ং সুষেক-মনুপক্ষিতং ॥৫

ইষ্কৃতাহাবমবতং সুবরত্রং সুষেচনং। উদ্রিণং সিঞ্চে অক্ষিতং ॥৬

প্রীণীতাশ্বান্‌ হিতং জয়াথ স্বস্তিবাহং রথমিৎ কৃণুধ্বং। দ্রোণাহাবমবতমশ্মচক্রমংসত্রকোশং সিঞ্চতানৃপাণং ॥৭

ব্রজংকৃণুধ্বং স হি বো নৃপাণো বর্ম্ম সীব্যধ্বং বহুলাপৃথূনি। পুরঃ কৃণুধ্বমায়সী-রধৃষ্টামাবাঃ সুস্রোচ্চমসোদৃংহতাতং ॥৮

আবো ধিয়ং যজ্ঞিয়াং বর্ত্ত ঊতয়ে দেবা দেবীং যজতা যজ্ঞিয়ামিহ।
সানো অদ্য দুহীয়দ্যবসেব গত্বী সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ ॥৯
আতু সিঞ্চ হরিমীং দ্রোরুপস্থে বাশীভিস্তক্ষতাশ্মন্ময়ীভিঃ।
পরিষ্বজধ্বং দশ কক্ষ্যাভিরুভে ধুরৌ প্রতি বহ্নিং যুনক্ত ॥১০
উভে ধুরৌ বহ্নিরাপিব্দমানোঽন্তর্যোনেব চরতি দ্বিজানিঃ।
বনস্পতিং বন আস্থাপয়ধ্বং নিষু দধিধ্বমখনন্ত উৎসং ॥১১
কপৃন্নরঃ কপৃথমুদ্দধাতন চোদয়ত খুদত বাজসাতয়ে।
নিষ্টিগ্র্যঃ পুত্রমাচ্যাবয়োতয় ইন্দ্রং সবাধ ইহ সোমপীতয়ে ॥১২

এই মন্ত্রসমূহের অনুবাদ যথা—

লাঙ্গলগুলি যোজনা কর, যুগগুলি বিস্তারিত কর, এই স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে বীজ বপন কর। আমাদিগের স্তবের সহিত

আমাদিগের অন্ন পূর্ণ হউক্। সৃণিগুলি নিকটবর্ত্তী পক্বশস্যে পতিত হউক্ ৩

লাঙ্গলগুলি যোজিত হইতেছে, কর্ম্মকারগণ যুগসমস্ত পৃথক্ করিতেছে। বুদ্ধিমান্‌গণ সুন্দর স্তব পাঠ করিতেছেন।৪

পশুদিগের জলপানস্থান প্রস্তুত কর; বরত্রা যোজনা কর, এই উৎসিক্ত অক্ষয় সুন্দর গর্ত্ত হইতে জল সেচন কর।৫

পশুদিগের জলপানস্থান প্রস্তুত হইয়াছে। এই উৎসিক্ত অক্ষয় জলপূর্ণ গর্ত্তে চর্ম্মরজ্জু বিদ্যমান আছে, অক্লেশে জল সেচন করা যায়; ইহা হইতে জল সেচন কর।৬

ঘোটকদিগকে পরিতৃপ্ত কর। ক্ষেত্রে স্থাপিত ধান্য গ্রহণ কর। নিরুপদ্রবে ধান্য-বহনযোগ্য রথ প্রস্তুত কর। এই জলপূর্ণ—পশুদিগের পানীয়জলাধার একদ্রোণ-পরিমাণ হইবে; ইহাতে প্রস্তর-নির্ম্মিত চক্র আছে। মনুষ্যদিগের পানীয়জলাধার স্কন্ধপরিমিত হইবে, ইহা জলপূর্ণ কর।৭

গোষ্ঠ প্রস্তুত কর। সেই স্থানই মনুষ্যগণের জলপানের উপযুক্ত। বহুসংখ্যক স্থূল কবচ সীবন কর। দৃঢ়তর লৌহপাত্র নিষ্কাশিত কর। চমস দৃঢ় কর, ইহা হইতে জল পরিশ্রুত না হয়।৮

হে দেবগণ! তোমাদের ধ্যান আবৃত্তি করিতেছি। অভিপ্রায়—যে তোমরা রক্ষা কর। সেই ধ্যান যজ্ঞের উপযোগী। সেই ধ্যান তোমাদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান করে। যেমন তৃণ ভোজন করিয়া গাভী সহস্রধারায় দুগ্ধ দেয়, তদ্রূপ সেই ধ্যান যেন আমাদের বাসনা পূর্ণ করে।৯

কাষ্ঠময় পাত্রে সংস্থাপিত হরিদ্বর্ণ সোমরসে দুগ্ধ সেক কর। প্রস্তরময় কুঠারদ্বারা পাত্র প্রস্তুত কর। দশ অঙ্গুলিদ্বারা পাত্রটী বেষ্টনপূর্ব্বক ধারণ কর। বাহক পশুকে রথের দুই পার্শ্বে যোজিত কর।১০

বহনকারী পশু রথের দুই ধুরা শব্দায়মান করিয়া গমন করিতেছে। * * কাষ্ঠনির্ম্মিত শকটে ইহার কাষ্ঠময় আধারে আরোপণ কর, উত্তমরূপে স্থাপন কর, ইহার মূলদেশ যেন খনন করিও না।১১

হে কর্ম্মাধ্যক্ষগণ! এই ইন্দ্র সুখদাতা, ইহাকে সুখময় সোম দান কর। অন্ন দিবার জন্য ইহাকে প্রেরণ কর, অনুরোধ কর। এই ইন্দ্র

অদিতির পুত্র। তোমাদের সকলেরই সমান পীড়াকর। অতএব রক্ষার জন্ত তাঁহাকে এখানে আহ্বান কর, তিনি সোম পান করিবেন।

এইরূপ অসংখ্যস্থানে কৃষির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে ৬। ১৪২ দর্শনে জানা যায়, বীজবপনকালে মন্ত্র পাঠ করা হইত। অথর্ব্ব-বেদে৬। ৫০ এ পশুপাল কীটাদি হইতে শস্য রক্ষার জন্ত প্রার্থনামন্ত্র দৃষ্ট হয়। অথর্ব্ব-বেদে ৩। ১৪ স্থান পাঠে অবগত হওয়া যায়,—আর্য্যগণ পশুপালনের উদ্দেশ্যে, পশু নিরাপদে রাখিবার জন্ত, যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা প্রার্থনা করিতেছেন। অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

এখন বাণিজ্যের কথা। ঋগ্বেদের ৫ মণ্ডলের ৩৪ সূক্তের ৭ম ঋক্ পাঠ করিলে, বাণিজ্যের কথা পাওয়া যায়। যথা,

"সমীং পণেরজতি ভোজনং মুষেবি দাশুষে ভজতি সুনরং বসু।
দুর্গে চ ন ধ্রিয়তে বিশ্ব আপুরু জনো যো অস্য তবিষীমচুক্রুধৎ।"

ইহার অর্থ,—"ইন্দ্র বণিকের ন্যায় ধন আহরণ করিতে গমন করেন, এবং মনুষ্যের শোভাবিধানকারী সেই ধন যজমানকে প্রদান করেন। যে সকল ব্যক্তি ধনবান্ ইন্দ্রের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করে, তাহারা মহাবিপদে পতিত হয়।" ইহা বাণিজ্যের পরিচায়ক।

বাণিজ্যদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়াদি সম্বন্ধে ঋগ্বেদ ৪ মণ্ডলের ২৪ সূক্তের ৯ ঋকে দৃষ্ট হয়।

ভূয়সা বস্নমচরৎ কনীয়ো ঽবিক্রীতো অকানিষং পুনর্যন,
স ভূয়সা কনীয়ো নারিরেচীদ্দীনা দক্ষাবি দুহন্তি প্রবাণং।

ইহার অর্থ এইরূপ যে, কেহ অনেকপরিমিত পণ্য দ্রব্য দ্বারা অল্প লাভ প্রাপ্ত হয়। পরে পুনরায় ক্রেতার নিকট যাইয়া "আমি বিক্রয় করি নাই" বলিয়া আরও মূল্য প্রার্থনা করে। বিক্রেতা "অনেক পণ্য-দ্রব্য দিয়াছি" বলিলেও, পূর্ব্বগৃহীত অল্পমূল্যের অধিক পাইতে পারে না। অল্পই হউক্ অধিকই হউক্, বিক্রয় কালে যে কথা বলে, তাহাই রহিয়া যায়।

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে ৫৬ সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্ 'তংগূর্ত্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবঃ।' এই ঋকের অর্থ—ধনার্থী বণিকেরা যেমন সঞ্চরণ করিয়া সমুদ্র ব্যাপিয়া থাকে; হব্যবাহী ব্রাহ্মণগণ, সেইরূপ

সেই ইন্দ্রকে সকল দিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। আর অধিক উদ্ধৃত করার প্রয়োজন দেখি না। ইহাতেই সমুদ্রগমন ও বিদেশবাণিজ্য প্রমাণিত হইতে পারে।

অথর্ব্ব-বেদে আরও দেখা যায়—বণিকৃগণ বাণিজ্যার্থে বিদেশ-যাত্রার সময়ে মঙ্গলার্থে যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন, তাহাতে বহু দূরদেশ-গমন ও বাণিজ্যদ্বারা ধনোপার্জ্জনের যথেষ্ট পরিচয় আছে। অথর্ব্ব-বেদের ৬।১১১ হইতে আসীতী মন্ত্র পাঠ করিলে, তাহার বিশেষ ব্যাখ্যা পরিদৃষ্ট হইবে। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করা হইল না। এই বাণিজ্য প্রভৃতি তখন সম্প্রদায়বিশেষের সম্পত্তি ছিল না। তখনও জাতিবিভাগ হয় নাই, এজন্য সর্ব্বসাধারণ ছিল, বুঝিতে হইবে। আগামিপরিচ্ছেদে আমরা আর্য্য-সমাজের জাতিভেদবিহীন অবস্থা এবং জাতির সৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা করিব।

প্রাচীন কালের বর্ণ-ভেদ ও পরবর্ত্তী জাতিভেদ।

সর্ব্ব প্রথমে অর্থাৎ যখন আর্য্যগণ সিন্ধুতীরে অবস্থিতি করিতেন, তখন জাতিভেদের উৎপত্তি হয় নাই। এই হিন্দুজাতির সর্ব্বাবস্থার পরিচায়ক ঋগ্বেদে জাতিভেদের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে 'বর্ণ' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ উহা জাতিবাচক নহে। বর্ণ বলিতে রঙ্ বুঝা যায়, যাহাদ্বারা আবৃত থাকা যায়—তাহাই বর্ণ। সর্ব্ব-শরীর ব্যাপিয়া বর্ণ অবস্থিত, তদ্বিষয়ে বিশেষ সংশয় নাই। অনার্য্য বিজিত দাসজাতি কৃষ্ণবর্ণ, আর জেতা আর্য্যগণ সিতবর্ণ ছিলেন। জেতা জিতকে সম্মান বা স্নেহপ্রদর্শন করিতে সতত প্রস্তুত নহে। আর্য্যগণ অনুগত দাসদিগের প্রতি যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করিতেন না, এবং তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার অধিকার প্রদান করিতেন না। সুতরাং, বর্ণভেদে আচার, ব্যবহার, সুখ, শান্তি বা কর্ত্তব্য লইয়া পরস্পরের মধ্যে বেশ প্রভেদ ছিল,

ইহাই অর্থাৎ আর্য্য-অনার্য্যের বর্ণভেদ তখন ছিল। যদি ঋগ্বেদের 'বর্ণ' অর্থ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয়, তবে তাহাদের পরস্পর ভিন্ন-বর্ণতানিবন্ধন একবংশীয়ত্বও অপ্রমাণিত হইয়া যায়। একই আর্যসম্প্রদায়ে যে তখন চারিবর্ণ অর্থাৎ শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই চারি প্রকারের মানব থাকিতে পারা সম্ভব, ইহা বোধ হয় না। যুদ্ধাদি রাজসকার্য্য যাঁহারা করিতেন, তাঁহাদের রজোগুণবাহুল্য-বশতঃ তাঁহারা রক্তাঙ্গ হইয়াছিলেন বোধ হয়;—এরূপ যুক্তি অনেকে উল্লেখ করেন, তাঁহাদের সারবত্তাশূন্য উক্তির প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে, অশ্বত্থামা বা দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, ইঁহারা রক্তবর্ণ হইয়াছিলেন, এমন প্রমাণ নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে তখনও যুদ্ধাদি কার্য্য বংশগত হয় নাই, সুতরাং উক্ত যুক্তি-চর্চ্চা বৃথা। কার্য্যানুসারে বর্ণপরিবর্ত্তন, এবং একসময়ের একবংশজ একদেশবাসী একসমাজের জাতিচতুষ্টয়-মধ্যে কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত—একথা নিতান্ত উপহাসের সামগ্রী। শূদ্র যে আর্য্যবংশ সম্ভূত নয়, তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে আছে। অথর্ববেদে আমরা দেখিতে পাই "তয়াহং সর্ব্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্য্যঃ।" এই স্থানে শূদ্র এবং আর্য্য ভিন্ন-রূপে উক্ত হইয়াছে। কাত্যায়নসূত্র-ভাষ্যকার লিখিয়াছেন "শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণঃ আর্য্যাস্ত্রৈবর্ণিকাঃ।" শূদ্র চতুর্থ বর্ণ, অপর তিন বর্ণ আর্য্য। এই শূদ্রের চতুর্থবর্ণতাজ্ঞাপক প্রমাণ অবশ্য প্রাচীন নহে, তথাপি ত্রৈবর্ণিকজাতি হইতে শূদ্রকে ভিন্ন করা হইয়াছে—ইহাই উহার প্রামাণ্যাংশ।

এখন একটী কথা—ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—ইহাদের নামোল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। যদি ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয়, তবে নামের গতি কি? ঋগ্বেদে যে 'ক্ষত্রিয়' বা 'ক্ষত্র' শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা কোনও জাতিবাচক রূপে গৃহীত নহে। ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্র অর্থ বলবান্। প্রথম মণ্ডলের ৬৪ সূক্তে মিত্র ও বরুণ সিন্ধুপতিও 'ক্ষত্রিয়' নামে কথিত হইয়াছেন। অন্যান্য দেবতাকেও স্থানে স্থানে 'ক্ষত্রিয়' বলা হইয়াছে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সপ্তম মণ্ডলের ৮৯ সূক্তে বরুণদেবকে 'সুক্ষত্র' সম্বোধন করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে 'বিপ্র' শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, উহা ব্রাহ্মণ-নামক জাতি-বিশেষের নাম নহে; জ্ঞানী বিজ্ঞ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত। অনেক স্থানে

দেবতাদিগকেও বিপ্র বলা হইয়াছে। অষ্টম মণ্ডলের ১১ সূক্তে "বিপ্রং দেবং অগ্নিং" লিখিত আছে,—উহার অর্থ ভাষ্যকারমতে—মেধাবী অগ্নি দেবতা। 'ব্রাহ্মণ' বা 'ব্রহ্ম' শব্দ ও জাতিবোধক ভাবে বেদে পাইনা। মন্ত্রপ্রণেতা 'ঋষি' অর্থে—ব্রাহ্মণ শব্দ প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। 'ব্রহ্ম' শব্দ সংস্কৃতাভিধানে বহু-অর্থ-বোধক। যেমন ঈশ্বর, ব্রাহ্মণজাতি, বেদমন্ত্র, বেদ, তপঃ, ব্রহ্মতেজঃ, বৃহৎ ইত্যাদি। 'বৈশ্য' বা বিশ্ শব্দের অর্থ জনসাধারণ বা প্রজাপুঞ্জ। বিশ্ ধাতুর অর্থ প্রবেশ করা। যাহাতে প্রবেশ করা যায়, তাহা অর্থাৎ গৃহ অর্থ বিশ্। যে প্রবেশ করে সেও বিশ্। স্থানের নামানুসারে স্থিতের নামকরণের অসংখ্যদৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। গৃহবাসী অর্থে বিশ্ বা বৈশ্য শব্দ ব্যবহৃত হওয়া অসঙ্গত নয়, কারণ উহাই তাহার প্রকৃত অর্থ।

এতক্ষণ পরে আমরা ঋগ্বেদে দশমমণ্ডলের একটী সূক্তের একটী ঋকে যে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যসৃষ্টির কথা আছে, তাহার আলোচনা করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলাম। মন্ত্রটী এই—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত।"

ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু ক্ষত্রিয় হইল, উরুদ্বয় বৈশ্য হইল এবং চরণ হইতে শূদ্র জন্মিল। এই সূক্তে, বিশ্বব্যাপী পরমপুরুষকে পশুস্বরূপে যজ্ঞীয় বহ্নিতে পূজা দেওয়া প্রসঙ্গে বলি-প্রদান করা হয়,—সেই বিভক্ত খণ্ডখণ্ডকৃত পুরুষ-পশুর মুখ ব্রাহ্মণ হইল, ইত্যাদি বর্ণনা করা হইয়াছে।

টীকাকার ভাষ্যকারগণ এই শ্লোকটীকে জাতিভেদের মূলস্বরূপে ব্যাখ্যা করিলেও, পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনায় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, ঐ সূক্তটী অগ্রপশ্চাৎ সমস্তই রূপকপূর্ণ। এই স্থানে গো, অশ্ব, ঋক্, সাম, ছন্দ প্রভৃতি বহু পদার্থের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সূক্তের ভাষা এবং ঋগ্বেদের অন্য সূক্তাবলীর ভাষাতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এই সূক্ত অত্যধিক আধুনিক বলিয়া প্রতীত হয়। এই সূক্তের প্রক্ষিপ্ততা বিষয়ে, স্বদেশের ও বিদেশের বেদচর্চ্চাকারিগণ একস্বরে অনুমোদন করেন। এই সূক্তের রূপক অস্বীকার করিলে, প্রকৃতপক্ষে ইহার অর্থই হয়না। মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী এই সূক্তকে আধুনিক এবং রূপকপূর্ণ

বলিয়া গিয়াছেন। সমাজ-শরীর যদি পুরুষপশুরূপে বর্ণিত হয়, তবে তাহারই খণ্ড খণ্ড করিলে মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয় ইত্যাদি হইতে পারে। এ সমস্ত রূপকের রহস্যোদ্ধার করা—কঠিন হইলেও কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ সমাজের রূপক বর্ণনা ঐ সূক্তের ঐ ঋকের উদ্দেশ্য হইলেও, উহা যে পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ মহাভারতাদি রচনার পূর্ব্বে জাতিভেদের প্রমাণস্বরূপে ঋগ্বেদে প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে আর সংশয় নাই। ঐ সূক্তে বৈদিক-শব্দের ব্যবহার নাই, বৈদিক-ব্যাকরণের দ্বারাও উহার পদ-সাধন আবশ্যক হয় না। এই প্রক্ষিপ্ত শ্লোক জাতিভেদের প্রমাণ হইলেও, প্রাচীন জাতিভেদের অর্থাৎ ঋগ্বেদ রচনার সময়ে, জাতিভেদের অস্তিত্বে সাক্ষ্য প্রদান করিতে সক্ষম হয় না। এই একটী মন্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে—এই দশ-সহস্রমন্ত্রপূর্ণ গ্রন্থরাজ ঋগ্বেদের মধ্যে জাতিভেদের কথা নাই, ইহাও বিস্ময়ের বা প্রক্ষিপ্তানুমানের উৎকৃষ্ট কারণ হইতে পারে। ঋগ্বেদে অসংখ্য বিষয় আছে, কেবল অভাব জাতিভেদের প্রমাণের। এই প্রক্ষিপ্ত শ্লোকটী তাহাও সমাপ্ত করিয়াছে।

এক্ষণে যজুর্ব্বেদের একটী অর্থবাদ বাক্য আলোচিত হওয়া আবশ্যক মনে করি। তাহাতে পুরুষ-সূক্তের ছায়া দর্শন করা যায়। যথা "প্রজা-পতিরকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়মিতি। স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত, তমগ্নির্দেবতা অন্বসৃজ্যত, গায়ত্রী ছন্দঃ রথন্তরং সাম ব্রাহ্মণো মনুষ্যানাং অজঃ পশূনাং তস্মাত্তে মুখ্যাঃ মুখতোহি অসৃজ্যন্ত ইত্যাদি।" এই মন্ত্রে মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ও বাহু হইতে ক্ষত্রিয় এবং উরু হইতে বৈশ্যের উৎপত্তির কথা আছে, কিন্তু এই প্রকারে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির জন্ম উক্ত হইলেও, তাহা যৌক্তিক হইতে পারেনা।

শূদ্র চরণ হইতে জন্মগ্রহণ করিল, এ কথা কি সম্ভব? ভারতে পূজ্যপাদ আর্য্যগণের পদার্পণের বহুপূর্ব্ব হইতে, শূদ্র নামক অনার্য্যজাতি বাস করিতেছিল। তাহাদের সহিত আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমেই সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। বহু শতবর্ষ পরে উত্তরমেরু-প্রদেশবাসী আর্য্যগণ পঞ্চনদ প্রদেশে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। এই বহুদূর-প্রবাসী আর্য্যবর্ণ এবং অনার্য্য শূদ্রবর্ণ পরস্পর অপরিচিত অজ্ঞাত অবস্থায় কতদিন জগতের

অন্ধকারে লুক্কায়িত ছিল, কে জানে? ইহারা এক পুরুষপশুর উদ্ধাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গ হইতে সমসময়ে জাত, একথা কিরূপে বিশ্বাস্য? অর্থবাদ-বাক্যের স্বতঃ-প্রমাণ্য নাই, ইহা বেদশাস্ত্রজ্ঞ মীমাংসকগণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অর্থবাদবাক্য স্বার্থপ্রতিপাদনে অক্ষম; পরার্থই উহার প্রতিপাদ্য, একথা মীমাংসা-শাস্ত্রের যে কোনও পুস্তক পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়। যদি স্বার্থ-বোধনে এই অর্থবাদবাক্য অক্ষমই হয়, তবে ইহার অর্থ লইয়া এত ব্যস্ত হইবার বা কারণ কি!

এই পুরুষসূক্তের ছায়া লইয়া, মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে ও মহাভারতাদিতে অনেক শ্লোক রচিত হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ উহাদের মূল পুরুষ-সূক্তের প্রক্ষিপ্ততা-বশতঃ, ইহারা কেহই প্রাচীনকালে জাতিভেদের প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারেনা। মনুসংহিতার ১ম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে পুরুষসূক্তের অবিকল অনুবাদ দৃষ্ট হয়। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে পুরূরবা ও মাতরিশ্বার কথোপকথনেও পুরুষ সূক্তের ব্যাখ্যা অর্থাৎ তদ্রূপ চাতুর্ব্বর্ণোৎপত্তি প্রকাশ আছে। বাজসনেয়সংহিতা এবং অথর্ব্ববেদ ও শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি বহু গ্রন্থে, বহু স্থানে বহুবার ঐরূপ পুরুষ-সূক্তানুযায়ি জাত্যুৎপত্তি-তত্ত্ব প্রদর্শিত হইলেও, উহা হইতে আদিমকালে জাতিভেদের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

জাতিভেদের মূলপ্রমাণ পুরুষসূক্ত, উহা প্রক্ষিপ্ত। যজুর্বেদ ইহার পরবর্ত্তী সময়ে বিরচিত, যজুর্বেদের যুগে আর্য্যগণ অশ্বমেধ, নরমেধ, অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোমাদি লইয়া বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত। পৌরোহিত্যপ্রধান যজুর্বেদে যাগযজ্ঞ—বিধি—ব্যবস্থাই অত্যধিক। এই গ্রন্থে পুরুষসূক্তের প্রক্ষিপ্তাংশের অনুকরণ স্বাভাবিক। মন্বাদি শাস্ত্রের ত কথাই নাই, যেহেতু তাহা অত্যধিক অর্ব্বাচীনকালের পুস্তক। পুরুষসূক্তের অবিকল অনুবাদই ঐ সকল গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইতে পারে। প্রাচীন কালে যে সমস্ত জাতিবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইত, উহাদের বংশানুগত-সম্প্রদায়-বাচকতা বহু পরে অবধারিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে উহারা জাত-বাচক ছিল না, কেবল ব্যবসায়ের পরিচায়করূপে গৃহীত হইয়াছিল। পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিলেও, তাঁহারা একই জাতি থাকিতেন, যে হেতু ব্যবসায়

সর্ব্বসাধারণ ছিল; কাহারও কৌলিক অধিকার উহার প্রতি আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিত না। ঋগ্বেদের একজন ঋষি ব্যবসায়ের পরিচয়ে কি বলিতেছেন শুনুন—"আমি স্তোত্র-কারক, পিতা চিকিৎসক, মাতা প্রস্তরের উপর ভর্জ্জিত যব পেষণ করেন। আমরা সকলে ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি। যেমন গাভীসমূহ গোষ্ঠ মধ্যে তৃণ-কামনায় বিভিন্ন দিকে বিচরণ করে, আমরাও সেইরূপ ধনলাভার্থে তোমার পরিচর্যা করিতেছি। হে সোম! অতএব তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও" এই অংশ পাঠ করিলে কি কেহ বলিবেন—"চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ব্যক্তি অম্বষ্ঠ?" মাতা ময়দা বা ছাতু প্রস্তুত করেন, পিতা কবিরাজ, পুত্র মন্ত্রপ্রচারকর্ত্তা ঋষি, ইহারা কোন্ জাতি? অবশ্য বলিতে হইবে, "বংশানুগত ব্যবসায়-নির্ব্বাচন তখনও সমাজে হয় নাই"

যজুর্ব্বেদের "পুরুষমেধ" নামক ত্রিংশৎ অধ্যায়ে, আমরা ব্রাহ্মণাদি চারি-বর্ণ, এবং অন্যান্য কতকগুলি ব্যবসায়ী ও আদিম অধিবাসীর নাম পাই। "শত রুদ্রীয়" নামক ষোড়শ অধ্যায়েও কতকগুলি ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু ব্যবসায় ব্যক্তিগত বিধায়, এবং বংশানুক্রমিক না হওয়ায়, তাহা হইতে জাতি-ভেদের প্রমাণ পাওয়া যায় না। পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায়গুলিকেই পরবর্ত্তী সময়ে বিভিন্ন জাতিতে কল্পনা করা হইয়াছে। ত্রয়োদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে—আমরা নিম্নলিখিত ব্যবসায়ী এবং ভারতের আদিম অধিবাসীদের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। যথা,—স্থপতি, স্তেন, তায়ু, তস্কর, মুষ্ণ, কুলঞ্চ, সারথি—তক্ষার, রথকার কুলাল, কর্ম্মার, নিষাদ। এই সকল নাম বংশানুগত ব্যবসায়ের পরিচায়ক হউক্, আর না হউক্, এগুলি পরবর্ত্তিপুস্তকে সঙ্করবর্ণ বলিয়া কথিত হওয়া অযৌক্তিক হইয়াছে। অবৈধ-প্রণয়ঘটিত সঙ্করবর্ণোৎপত্তির পূর্ব্বে, দেশে ঘট গড়িবার, কাপড় বুনিবার লোক ছিলনা; এরূপ চিন্তার সমীচীনতা কোথায়?

একই আর্য্যবর্ণ পরবর্ত্তিকালে সমাজের প্রসারের সহিত, সামর্থ্য-বৃদ্ধির অনুরূপভাবে, আপন আপন কর্ত্তব্য সাম্প্রদায়িকরূপে বিভাগ করিয়া লন। তাহাতেই যুদ্ধব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ ক্ষত্রিয় এবং বাণিজ্য-কৃষি-ব্যবসায়ীগণ বৈশ্য হইলেন। যাহারা জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা সমাজের

ইষ্ট-সংসাধন করিতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ ছিলেন। একই আর্য্যবংশ কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠন করিয়া, পরস্পরের সহিত অংশতঃ বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, তাঁহাদের বৈবাহিক কার্য্যাদিও ক্রমশঃ অল্পে অল্পে সঙ্কীর্ণ সীমায় মধ্যে আসিয়াছিল। পরিশেষে বহুকাল বিভিন্ন ব্যবসায়, অবস্থা, নীতির পোষণ করিয়া, তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা—তাঁহারা এতই বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, যে, অর্ব্বাচীন গ্রন্থের গ্রন্থকারগণ—আর তাঁহাদিগকে একবংশজ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। নিজেরাও বহুকাল পার্থক্যে অভ্যস্ত হওয়ায়, একবংশীয়তা বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিলেন। তবে তাঁহাদের অর্থাৎ ত্রৈবর্ণিক আর্য্যগণের মধ্যে যে প্রথমে পার্থক্য ছিল না, এবং সকলেই এক বর্ণ ছিলেন, একথা তাঁহারা একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারিয়া ছিলেন না। ছায়াপথের ন্যায় তাহার সেই স্মৃতির অবিস্পষ্ট আলোকরেখা—তাঁহাদের অন্তঃকরণ আলোকিত করিত। দুই একটি স্থানে তাহার নিদর্শন আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে "এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ। দেবো নারায়ণো নান্যঃ একোঽগ্নির্বর্ণ এবচ।" ইহার অর্থ এই যে—পুরাকালে সর্ব্ববাঙ্ময় প্রণবই একমাত্র বেদ ছিল। এক নারায়ণই দেবতা ছিলেন। এক অগ্নি ও একমাত্র বর্ণ ছিল। ইহাতে এক আর্য্যবর্ণ বা ব্রাহ্মণবর্ণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে পারে।

পুরাকালে বর্ণভেদ যে ছিলনা, তাহার আরও আভাস শ্রীমহাভারতে পাওয়া যায়, যথা,—"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ, ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতং।" বর্ণের কোনও বিশেষ বা পার্থক্য নাই, সর্ব্বজগৎ ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম দ্বারা প্রথমে (একভাবে) সৃষ্ট হইয়া, পরে বিচিত্রকর্ম্মবশে বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বুঝিলাম, এক জাতীয় একবংশীয় ব্যক্তিগণ প্রথমে অবিভক্ত ছিলেন, পরে ভিন্ন কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, ভিন্ন জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ জাতি বা বর্ণভেদ আগন্তুক। আদি-বর্ণকে দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ-বর্ণ বলা যাইতে পারে।

এই একই বর্ণ যে কর্ম্মান্তর গ্রহণ দ্বারা, ত্রিবর্ণ সৃষ্টি অর্থাৎ আপনাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ-স্বরূপে মহাভারতের আর কয়েকটী বচন উদ্ধৃত না করিয়া পারা যাইতেছেনা।

প্রমাণ যথা,—কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ। ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ।। গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ। স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ। হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ। কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাঃ তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥ যে সকল ব্রাহ্মণ কামভোগপ্রিয়, তীক্ষ্ণ, ক্রোধপরবশ,—সাহসপ্রিয় স্বধর্ম্মত্যাগী রক্তবর্ণ, তাহারা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইল। যাহারা গোরক্ষা, কৃষি প্রভৃতি বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে, যাহারা ব্রাহ্মণোচিত-ধর্ম্মত্যাগী, পীতবর্ণ, সেই সকল ব্রাহ্মণ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইল। আর যাহারা হিংসা ও মিথ্যাপরতন্ত্র, ব্যবসায়স্থিরতাহীন, লোভী, শুচিতাবিহীন, কৃষ্ণবর্ণ, তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইল। একবংশীয় লোক ব্রাহ্মণেরা—কর্ম্মবশে এক দেশে বাস করিয়া ভিন্ন বর্ণ হইয়া গেলেন;—কাহারও রং লাল, কেহ কাল, কেহ একেবারে পীতবর্ণ—এসব অসম্ভব;—কিন্তু এক ব্রাহ্মণ বা আর্য্যবর্ণ কর্ম্মানুসারে জাতি বা সম্প্রদায় গঠন করিয়া, পৃথক্ ভিন্ন জাতি হইল, কেহ কেহ অনার্য্যবংশের সহিত মিলিত হইয়া, তদ্ব্যবহার গ্রহণ করিল,—এই টুকু সত্যের স্মৃতি এই শ্লোকগুলি পাঠে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময়ে জাতি-সৃষ্টি এবং ব্যবসায়ের স্থিরতা সংঘটিত হইয়াছে।

আমরা বুঝিলাম, একই বংশের লোকসমুদয়—প্রথমে একভাবে অস্থির ব্যবসায়ের অনুসরণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত, তখন তাহারা একজাতি ছিল। পরে সমাজবৃদ্ধির সহিত কর্ত্তব্যবৃদ্ধি সমুপস্থিত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের বা কর্ত্তব্যের দ্বারা ভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইয়া, ভিন্ন বর্ণ সৃষ্টি করা হইল পরাজিত দাস শূদ্রগণকে সমাজের নিম্ন স্থানে স্থাপন করা হইল। সময়ে আর্য্যবংশীয়েরা অনেকাংশ শূদ্রকে আপন করিয়া লইলেন। বহুদিন পরে পার্থক্যাবস্থিতি-নিবন্ধন ভিন্ন ব্যবসায়ী ভিন্ন জাতিরা—ভিন্ন বংশোদ্ভুত বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া, দলাদলির সৃষ্টি করিল। এই সময়ে, ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, ব্যভিচারের দ্বারা জন্মোৎপত্তি সমর্থনের উপায় উঠিল। অজ্ঞ অন্ধ স্বাতন্ত্র্যাকাঙ্ক্ষী সম্প্রদায়সকল—তাহাতেই অনুমোদন করিয়া কৃতার্থ হইল। বহুদিনাবসানে তাহাই প্রবল প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইতে লাগিল। এতক্ষণে দেখিলাম, আদিতে জাতি বা বর্ণভেদ

ছিল না, পরে গুণকর্ম দ্বারা, উহার সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা অধুনা গুণকর্ম্মের কথার আলোচনা করিব।

গুণকর্ম্ম এবং জাতিভেদ।

প্রকৃতির নিয়ম, প্রতিষ্ঠিত হইতে যোগ্যতা চাই। অযোগ্যের অনাদর শাশ্বত প্রথা। যোগ্যতার পরিচয় গুণকর্ম্ম। "উৎকর্ষ" কথাটি কেবল গুণকর্ম্মেরই অনুবর্ত্তী। জাতিভেদের উচ্চনীচস্তর-বিভাগ অবশ্যই গুণানুসারে সমর্থিত হইয়াছিল। পরে সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষা, বা ব্যক্তিগত স্বার্থ বহু ব্যক্তির স্বার্থের সহিত অভিন্ন হইয়া যাওয়ায়, প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠার জন্য, ইহার অভ্যন্তরে মৌলিক সত্যের অবমানিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মূলে সে ক্রটী ছিলনা। সমাজের ন্যায়পক্ষপাত বা উদারতা যখন অত্যধিক প্রবল ছিল, তখন সঙ্কীর্ণতাপ্রসূত নীচতার পরিচয় পাওয়া যাইতনা। আমরা শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে গুণকর্ম্মানুযায়ী জাতিভেদের একটু আলোচনা করিব। সর্ব্বপ্রথমে মাননীয় গীতাশাস্ত্রের উক্তি—"চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।" এই অংশ আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। শ্রীজগন্নাথ কৃষ্ণের শ্রীমুখের উক্তি এই যে গুণকর্ম্মানুসারে আমি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।

গুণ সত্ব, রজঃ, তমঃ। এই তিনটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া, শম দম প্রভৃতি কর্ম্মের আলোচনা করিয়া, ভগবান্ সমগ্রসমাজকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। গীতাভাষ্যে শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "গুণাঃ সত্বরজস্তমাংসি তত্র সাত্বিকস্য সত্বগুণপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমদমাদীনি কর্ম্মাণি—সত্বোপসর্জ্জন রজঃপ্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি, রজউপসর্জ্জনতমঃ-প্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম্ম, ইত্যেবং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" ব্রাহ্মণের সত্বগুণ এবং শমদম প্রভৃতি কর্ম্ম। ক্ষত্রিয়ের সত্বগুণ মলিন এবং রজোগুণ প্রধান, যুদ্ধাদি কার্য্য। বৈশ্যের তমোগুণ মলিন ও রজোগুণ প্রধান, কার্য্য কৃষি বাণিজ্যাদি। শূদ্রের রজোগুণ মলিন তমোগুণ প্রধান, কার্য্য

সেবা—শুশ্রূষা। ইহাই গুণকর্ম্মবিভাগ অনুসারে জাতিসৃষ্টি। সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন শমদম-তপস্যাদিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা হইল, এবং সমাজের শীর্ষদেশে স্থাপন করা হইল। গীতাব্যাখ্যাকার শ্রীমান্ শ্রীধর স্বামী এবং ভাষ্যব্যাখ্যাতা শ্রীমান্ আনন্দগিরি প্রভৃতি মহোদয়গণ তাঁহারই প্রতিধ্বনি সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। সংক্ষেপতঃ ব্রাহ্মণ সাত্ত্বিক, ক্ষত্রিয়—বৈশ্য রাজস এবং শূদ্র তামস—ইহাই শ্রেণীবিভাগের পরিচয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে পার্থক্য এই মাত্র, ক্ষত্রিয়ের রজোগুণ প্রবল হইলেও উহা সত্ত্বসংসৃষ্ট, এবং সত্ত্বগুণকে উপসর্জ্জনভাবে অর্থাৎ সহকারিরূপে গৌণভাবে গ্রহণ করিয়াছে; আর বৈশ্যের রজোগুণ প্রধান হইয়াও তাহা সত্ত্বকে উপসর্জ্জনরূপে গ্রহণ করে নাই, অপিচ তমোগুণকে সংসৃষ্ট গৌণ-গুণরূপে গ্রহণ করিয়াছে। জগতের যাবদীয় বস্তুব্যক্তিজাতে ত্রিগুণ-সম্মিলন আছে। দর্শনশাস্ত্রের রহস্য—সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয় হইতে জড়জীবজগৎ সৃষ্ট! সুতরাং মানব কেবল সত্ত্বগুণশালী হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে সত্ত্বগুণ অধিকমাত্রায় যে দেহে বিদ্যমান, শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে সাত্ত্বিক ব্যক্তি বলা যাইতে পারিবে।

পূজ্যপাদ আচার্য্য মনু বলেন—"যো যদৈষাং গুণোদেহে সাকল্যে-নাতিরিচ্যতে। স তদা তদ্‌গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্।" সত্ত্ব রজ তম এই গুণত্রয়ের মধ্যে, যে দেহে যে গুণের আধিক্য পরিলক্ষিত হইবে, সে দেহী সেই গুণসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সত্ত্বগুণের আধিক্য বশতঃ মানব 'সাত্ত্বিক' সমাখ্যায় ভূষিত হইবে, আবার রজো-গুণের আতিশয্যে 'রাজস' নাম ধারণ করিবে, সুতরাং জগৎ ত্রিগুণাত্মক হইলেও মানব সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস নাম গ্রহণের অধিকারী। সত্ত্ব-গুণের যাহা লক্ষণ—সেগুলি সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণের নিজস্ব। এইরূপ রজোগুণের লক্ষণ অল্পাধিক-তারতম্যানুসারে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যে বিদ্যমান ছিল। তমোগুণের লক্ষণ শূদ্রে সংস্থিত ছিল।

মহামান্য মনুসংহিতায় দেখা যায়—"বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানং শৌচ-মিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধর্ম্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্।" ১২।৩১। আবার দেখা যায়—"যৎ সর্ব্বেনেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্। যেন

তুষ্টিশ্চ যদাত্মনঃ তৎ সত্ত্বগুণলক্ষণম্"। ১২।৩৭। রাজসলক্ষণ যথা,—"আরম্ভরুচিতা ধৈর্য্যমসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ। বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্।" ১২।১২। আরও "যেনাস্মিন্ কর্ম্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুষ্কলাং। নচ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ন্তু রাজসং। ১২।৩৬। তামসলক্ষণ যথা—লোভঃ স্বপ্নোঽধৃতিঃ ক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা। যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্। ১২।৩৩। অপিচ—যৎ কর্ম্মকৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি। তজ্জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণলক্ষণম্। ১২।৩৫। আরও দেখা যায়—"তমসোলক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ এবচ। সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ—শ্রেষ্ঠমেষাং যথোত্তরং। ১২।৩৮। এই শ্লোকগুলির অর্থ এইরূপ যথা;—মানবীয় সত্ত্বগুণের লক্ষণ বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধর্ম্মকার্য্য, আত্মচিন্তা। যাহা সকলে জানিতে চাহে, যাহা আচরণ করিলে লজ্জা পাইতে হয় না। যাহা দ্বারা আত্মা পরিতুষ্ট থাকে, তাহাই সত্ত্বগুণের লক্ষণ। রাজসলক্ষণ যথা—আরম্ভপ্রিয়তা, অধৈর্য্য, অসৎকার্য্য, পরিগ্রহ, সর্ব্বদা বিষয়সেবা, খ্যাতিজনক কর্ম্মানুষ্ঠান ও দৈন্যাবস্থায় শোকপ্রকাশ ইত্যাদি। তামসলক্ষণ যেমন—লোভ, স্বপ্ন, অধৃতি, ক্রূরতা, নাস্তিকতা, ভিন্ন-ব্যবসায়াবলম্বন, যাচ্ঞাশীলতা, প্রমাদ ইত্যাদি। যে কার্য্য করিলে পরে লজ্জিত হইতে হয়, যে কার্য্য করিতে করিতে নিন্দিত হইতে হয়, তাহা করিতে চাহিলেও ঘৃণিত হইতে হয়, সেই সকল কার্য্যই তমোগুণের লক্ষণ। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে, তমোগুণের লক্ষণ কাম, রজোগুণের লক্ষণ অর্থ এবং সত্ত্বগুণের লক্ষণ ধর্ম্ম। পূর্ব্ববর্ত্তী অপেক্ষা পরবর্ত্তীটী যথাক্রমে উৎকৃষ্ট, সুতরাং ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাহা সত্ত্বগুণের লক্ষণ বলা হইল, তাহাই সত্ত্বগুণাধিক ব্রাহ্মণেরও লক্ষণ বুঝিতে হইবে। রজোগুণের লক্ষণ ভিন্নভাবে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যে দর্শন করা যাইবে।

শ্রীমনুসংহিতায় আরও দেখা যায়—"সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতং। এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ ১২।২৬। তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ। প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ। ১২।২৭। যত্তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকর মাত্মনঃ। তদ্রজোঽপ্রতীপং বিদ্যাৎ সততং হারি দেহিনাং। ১২।২৮। যত্তু স্যান্মোহসংযুক্তং অব্যক্তং

বিষয়াত্মকং। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদ্গুণমাদিশেৎ।১২।২৯। এই শ্লোক-গুলির ব্যাখ্যা এইরূপ যথা,—সত্ত্বগুণের লক্ষণ জ্ঞান, তমোগুণের অজ্ঞান, আর রজোগুণের লক্ষণ রাগ-দ্বেষ। সকলশ্রেণীরই তিনগুণ আছে। যখন আত্মার প্রীতিকর, শুদ্ধাত্ত, প্রকাশ—কোনও ভাবের উদয় হইতে দেখা যাইবে, তখন বুঝিতে হইবে, তাহা সত্ত্বগুণ-প্রকাশ। যাহা নিজের অপ্রীতিকর, দুঃখযুক্ত ও প্রতিকূল, তাহাকেই অনিষ্টোৎপাদক রজোগুণ-বিকাশ বলিয়া বুঝিবে। যাহা মোহযুক্ত, অপরিস্ফুট, বিষয়াত্মক, অপ্রতর্ক্য, অজ্ঞেয়, তাহাকেই তমোগুণ-ব্যক্তি বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে।

সাংখ্য-পাতঞ্জল-দর্শন, গীতাশাস্ত্র ও মহাভারতাদি ইতিহাস ও পুরাণ-গ্রন্থে গুণত্রয়ের বহুবিধ লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নাই, তবে শ্রীগীতার কয়েকটী শ্লোক মাত্র উদ্ধৃত করিয়া, আমরা এ প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি সম্পাদন করিব। গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দেখা যায়—সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে। জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাৎ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত।১৪।১১। লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা। রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন!১৪।১২। অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদোমোহ এবচ, তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ!১৪।১৩! সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসোলোভ এবচ। প্রমাদমোহৌ তমসোভবতোঽজ্ঞানমেবচ।১৪।১৪। এই সকল শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকল ইন্দ্রিয়ে জ্ঞানাত্মকপ্রকাশের আধিক্য পরিলক্ষিত হইবে, তখন জানিতে হইবে, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। হে কুরু নন্দন! যে সময় লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ (যাহা লৌকিক-প্রতিষ্ঠাপদ তাদৃশ কর্ম্মারম্ভ) স্পৃহা, অশম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন জানা যায়, রজোগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। আবার হে ভরতর্ষভ! যখন তমোগুণ আতিশয্য প্রাপ্ত হয়, তখন অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ মোহ ইত্যাদি আবির্ভূত হইতে থাকে। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ, এবং প্রমাদ আর মোহ—তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। শাস্ত্রে সকল কার্য্য, ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদির সাত্ত্বিক-রাজস-তামস-বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে; বিস্তারশঙ্কায় তাহা পরিত্যক্ত হইল।

গুণানুসারে ও কর্ম্মানুসারে জাতিভেদ সমর্থিত হইয়াছিল, এবং যাহা অত্যধিক গৌরবের কথা—তাহাই আলোচনা করিতে গিয়া, আমরা ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক গুণকর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের রাজস গুণকর্ম্ম এবং শূদ্রের তামস গুণকর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভিমত কি, তাহা দেখিলাম। এখন ব্রাহ্মণাদির লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি আছে, তাহা দেখিব।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে—সপ্তম স্কন্ধে দেখা যায়—শমোদমঃ তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবং। জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্ম-লক্ষণম্। ৭। ১১। ২১। শৌচং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজঃ ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা। ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্। ৭। ১১। ২২। দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তি-স্ত্রিবর্গপরিপোষণং। আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্। ৭।১১।২৩। শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া। অমন্ত্র-যজ্ঞোহ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্। ৭। ১১। ২৪। বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ। স্বভাবজং কর্ম্ম হিত্বা শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ। ৭। ১১। ২৫। এই শ্লোকগুলির সংক্ষিপ্ত অর্থ এইরূপ যথা,—ইন্দ্রিয়-সংযম, মনঃ-সংযম, তপস্যা, শুচিতা, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, ঈশ্বরপরতা এবং সত্য এই গুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, তেজঃ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ, সত্য এই সকল ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। দেবতা, গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তি, ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গের পরিপোষণ, আস্তিকতা, নিত্য উদ্যম, নিপুণতা, বৈশ্যের লক্ষণ। শূদ্রের সন্নতি, শুচিতা, অকপট প্রভুভক্তি ও গোব্রাহ্মণরক্ষা ইত্যাদি লক্ষণ। স্বভাববিহিত বৃত্তি দ্বারা, সকল-কর্ত্তব্য-কর্ম্মকারী পুরুষ ক্রমে স্বভাববিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, নির্গুণতা বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এই প্রমাণগুলি পাঠ করিয়া আমরা দেখিলাম, ব্রাহ্মণলক্ষণগুলি সত্ত্বগুণপ্রধান ভাবেই এখানে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের রাজসভাববহুলতা সত্ত্বেও সাত্ত্বিকগুণের উল্লেখ দৃষ্ট হই-তেছে। বৈশ্যের রজস্তমঃ-সম্মিলনের আভাস এ লক্ষণে পাওয়া গেল। এখন বলা যাইতে পারে 'গুণকর্ম্মবিভাগশঃ' কথার যাহা তাৎপর্য্য—এ লক্ষণগুলি তাহাই পক্ষান্তরে প্রমাণ করিতেছে।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে ভৃগুভরদ্বাজ-সম্বাদে দেখিতে পাই, ভরদ্বাজ

জিজ্ঞাসা করিতেছেন ;—"ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়োবা দ্বিজোত্তম ! বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে ! তদ্‌ ব্রূহি বদতাম্বর ! ২১।" অর্থাৎ হে বদতাম্বর ! ব্রাহ্মণ কি প্রকারে হয়, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রই বা কিরূপে হয়, তাহা আমাকে বলুন। প্রত্যুত্তরে ভৃগু বলিতেছেন "জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ। বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ব অবস্থিতঃ।২২ শৌচাচারস্থিতঃ সম্যক্‌ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ। নিত্যব্রতঃ সত্যপরঃ সবৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে। ২৩ সত্যং দানমথা-দ্রোহঃ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা। তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ২৪ অগ্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ। দানাদানরতির্যস্তু সবৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে। ২৫ বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ। বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ। ২৬ সর্ব্বভক্ষ্যরতিনিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ। ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ সবৈ শূদ্র ইতিস্মৃতঃ ২৭ যে ব্যক্তি জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত ও শুচি, বেদাধ্যায়নসম্পন্ন, ষট্‌কর্ম্মশালী (সন্ধ্যা-বন্দনা, জপ, হোম, দেবপূজা, অতিথিসৎকার এই গুলি ষট্‌কর্ম্ম—মতান্তরে অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, সৎপাত্রে দান, সৎপ্রতিগ্রহ এই গুলি।) শৌচাচারস্থ, দেবপ্রসাদভোজী, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ সে ব্রাহ্মণ। সত্য, দান, অদ্রোহ, আনৃশংসতা, অকার্য্যকরণে লজ্জা, নিন্দাকার্য্যে ঘৃণা, ও তপস্যা যাহাতে দেখিবে, সেই ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। যিনি বেদাধ্যয়ন করেন, আর্ত্তত্রাণব্রতে দীক্ষিত, সৎপাত্রে দান করেন, এবং প্রজাবর্গের নিকট হইতে উপযুক্ত কর গ্রহণ করেন, তিনি ক্ষত্রিয়। বৈশ্যও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন হইবেন। পশুরক্ষা, কৃষি, ধনোপার্জ্জন, প্রিয় ও শুচি হওয়া বৈশ্যের লক্ষণ। যাহার খাদ্যাখাদ্য-বিচার নাই, ভালমন্দ কর্ম্মের বিচার নাই, যে বেদত্যাগী, আচারবিরহিত—সে শূদ্র বলিয়া কথিত।

এই শ্লোকগুলি পাঠ করিলে, কেবল নৈতিক উচ্চনীচতা ভিন্ন, জাতিভেদের মধ্যে আর একটী জিনিষ—অর্থাৎ ব্যবসায় বা জীবিকাপার্থক্যও অবগত হওয়া যায়। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন যাজনাদি ব্রাহ্মণের, যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়ের, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন বৈশ্যের স্থির ব্যবসায়—ইহাই এখানে জানা যায়। বংশানুক্রমিক একব্যবসায়িতা জাতিভেদের কারণ রূপে এই সময়ে গৃহীত হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ, শূদ্রের কর্ত্তব্য স্থির

নাই বলায়, অপর ত্রিবর্ণের নির্দ্দিষ্ট উপদিষ্ট কার্য্যই কর্ত্তব্য-কার্য্যরূপে অবধারিত হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতে যে শূদ্র-লক্ষণ দেখিয়াছি, তাহাতে গোবিপ্ররক্ষা, শুচিতা ইত্যাদি তাহার গুণের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে; মহাভারতীয় শূদ্রে তাহা নাই। বরঞ্চ অশুচিতা, ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারহীনতা ইত্যাদি অসদ্গুণেরই উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। ইহাতে বোধ হয়, মহাভারতোক্ত শূদ্র শ্রীমদ্ভাগবতের শূদ্রের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। প্রথম অনার্য্য শূদ্রগণ ঐরূপই ছিল, পরে বহুকাল আর্য্যসংসর্গে দাসত্ব-স্বীকার পূর্ব্বক পরিবারভুক্ত হইয়া থাকায়, তাহাদের নৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, কিন্তু যাহা লইয়া শূদ্রত্ব—সেই দাসত্ব কখনও অপহৃত হইবার নহে। সেই জন্য স্বামি-সেবা শূদ্রের প্রধান কর্ম্ম রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারতের পরবর্ত্তীকালে শ্রীমদ্ভাগবত রচিত, একথায় কাহারও বিবাদ নাই।

আমরা আরও আলোচনা করিলে, ব্রাহ্মণাদি-লক্ষণের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাইব। আর একটী স্থানে চতুর্ব্বর্ণের কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। সেই শ্লোক এই—'অধীত্য ব্রাহ্মণো বেদান্ যাজয়েত যজেত চ। ক্ষত্রিয়োধনুরাশ্রিত্য যজেচ্চৈব ন যাজয়েৎ। বৈশ্যোঽধিগম্য বিত্তানি কৃষিকর্ম্মাণি কারয়েৎ। শূদ্রঃ শুশ্রূষণং কুর্য্যাৎ ত্রিষু বর্ণেষু নিত্যশঃ।' ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করিয়া নিজে যজন করিবে এবং অপরকে যাগাদি করাইবে। ক্ষত্রিয় ধনুর্ব্বাণাশ্রয় করিবে, যাগাদি করিবে, কিন্তু পৌরোহিত্য করিবে না। বৈশ্য বিত্তাদি বিষয় অবগত হইয়া, কৃষিকর্ম্ম করিবে, আর শূদ্র ত্রিবর্ণের শুশ্রূষা করিবে। এখানে আমরা পাইলাম, ব্রাহ্মণের যজন-যাজনাদি, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি; বৈশ্যের কৃষিকর্ম্ম এবং শূদ্রের দ্বিজাতির সেবা—শুশ্রূষা করাই অসাধারণ লক্ষণ।

নৈতিক উন্নতি বা অন্যবিধ জ্ঞানাজ্ঞানের পরিচয় সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। কর্ম্ম বা জীবিকা দর্শনেই সাধারণতঃ 'জাতি' চিনিতে হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখা যায়—শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেবচ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং। শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং। দানং ঈশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজং। কৃষিগো-রক্ষ-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং। পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং।

অর্থাৎ—শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিকতা, এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন না করা, দান ও ঐশ্বর্য্য অথবা প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম। কৃষিকার্য্য, গোপালন, বাণিজ্য এইগুলি বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম। শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম পরিচর্য্যা। এইগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়, ব্রাহ্মণের জ্ঞানচর্চ্চা নিত্যসহচর, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ আমরণসঙ্গী, বৈশ্যের কৃষিবাণিজ্য গোরক্ষা জীবনের সহচর, শূদ্রের একমাত্র পরিচর্য্যাই সর্ব্বস্ব।

মান্য মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ। প্রজানাং রক্ষণং দানং ইজ্যাধ্যয়নমেবচ। বিষয়েষু প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ। পশূনাং রক্ষণং দানং ইজ্যাধ্যয়নমেবচ। বণিক্-পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ। একমেবতু শূদ্রস্য প্রভু-কর্ম্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষাচানসূয়য়া। অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ এইগুলি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট। প্রজারক্ষণ, দান, যজন, অধ্যয়ন, বিষয়প্রসক্তি ক্ষত্রিয়ের সংক্ষিপ্ত কর্ত্তব্য। পশুরক্ষা, দান, যজন, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, তেজারতী, কৃষিকার্য্য এইগুলি বৈশ্যকর্ত্তব্য। শূদ্রের একমাত্র কর্ত্তব্যকার্য্য প্রভুর আজ্ঞাপালন ও ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যা। এই সকল প্রমাণে দেখিতে পাইলাম, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিনেরই যজন, অধ্যয়ন, দান আছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণদ্বয়ের যাজন ও অধ্যাপন নাই। সুতরাং ধরিতে গেলে, ঐ দুইটী ব্রাহ্মণের অসাধারণ নিদর্শন। প্রজাপালন, যুদ্ধাদি কার্য্য ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য, অন্য কাহারও উহা নাই, সুতরাং উহাই অসাধারণ লক্ষণ। বৈশ্যের অসাধারণ কর্ম্ম কৃষি, বাণিজ্য, কুসীদ এবং পশুপালন, সুতরাং উহাই প্রধান লক্ষণ। শূদ্রের অসাধারণ লক্ষণ পরিচর্য্যা। আমরা আরও অসংখ্য শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া, এই সকল বিষয়ে ভূরিভূরি প্রমাণ দিতে পারি—কিন্তু, যাহা বলা হইল, ইহাই বোধ হয় যথেষ্ট।

এইক্ষণ বিবেচ্য এই যে, এই গুণকর্ম্ম বংশগত সামগ্রী কি না? গুণকর্ম্ম বংশানুগত সম্পত্তি নহে, কিন্তু বংশানুক্রমিকতার সহিত উহার পরোক্ষতঃ সম্পর্ক আছে মাত্র। আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি,

বুদ্ধিমানের সন্তান মহামূর্খ, অজ্ঞব্যক্তির সন্ততি বিদ্বান্, সদাচারের বংশধর দুরাচার এবং নাস্তিককুলে পরমভক্তও আবির্ভূত হইতেছে। এখানে আমরা অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইব, বংশানুক্রমিক শক্তি—সাধারণ-নিয়ম মাত্র, বহুস্থানে বিশেষ কারণে উহার ব্যভিচার পরিলক্ষিত হইবে। গুণকর্ম্ম জাতিভেদের নিদান, উহা একবংশীয়দের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাইলে, তাহাদের একজাতিত্বে বাধকস্বরূপে গণ্য হইতে পারে। যে যদৃশগুণের অধীশ্বর, সে তদনুরূপ জাতির অন্তর্ভুক্ত—বলিয়া গৃহীত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে—"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।" অর্থাৎ যে জাতীয় পুরুষের বর্ণ বা জাতি-পরিচায়ক যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহা যদি তজ্জাতীয় ব্যক্তির বাহিরে অন্য ব্যক্তিতেও দৃষ্ট হয়, তবে সেই ব্যক্তিকে লক্ষণানুসারে তজ্জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। যদি বৈশ্য-জাতীয় ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে ঐ ব্যক্তিকে বৈশ্য সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, ব্রাহ্মণ-সমাজে স্থান দিতে, শাস্ত্র অনুমতি দিলেন। কথাটী বড় নিয়ম! সম্প্রতি চিন্তনীয় বটে!!

আরও দেখা যাইতেছে, "শূদ্রেচৈতদ্ ভবেল্লক্ষং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ" শূদ্রের লক্ষণ যদি শূদ্রে না থাকে, এবং ব্রাহ্মণের লক্ষণ যদি ব্রাহ্মণে না থাকে, তবে সেই শূদ্রও শূদ্র নয়, সেই ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নয়। এস্থানে সুস্পষ্ট প্রকারে প্রতিপাদিত হইল যে, লক্ষণানুসারেই ব্রাহ্মণত্বাদি নির্দ্ধারিত হইবে। গুণকর্ম্মের উৎকর্ষ অনুসারে, উচ্চবর্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধে—শাস্ত্রের আরও অশেষ আদেশ আছে। গুণকর্ম্মের অপকর্ষনিবন্ধন অপকৃষ্টবর্ণ-প্রাপ্তির ও প্রমাণের অভাব নাই। মানবধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, 'তপোবীজ-প্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে। উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ।" তপস্যা এবং বীজপ্রভাবের দ্বারা, মনুষ্য জাতীয় উৎকর্ষ ও অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। জন্মানুসারেও এক প্রকার শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতা প্রাপ্তি হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সতত্ই গুণকর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষের উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে গৌতম স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন যথা,—"বর্ণান্তর-গমনং

উৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং” এখানে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অনুসারে, উৎকৃষ্টবর্ণ এবং অপকৃষ্টবর্ণ-প্রাপ্তির কথা বলা হইল। আচার-ব্যবহার ক্রিয়া-কাণ্ডের অভাবে, জাতির উৎকর্ষ লুপ্ত হইয়া অপকর্ষ সংস্থাপিত হয়, এ বিষয়ে মহর্ষি বলিতেছেন “শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ। পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজাঃ যবনাঃ শকাঃ। পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খশাঃ।” ইহার অর্থ এই যে, এই সকল ক্ষত্রিয়জাতি স্ববর্ণোচিত ক্রিয়া লুপ্ত হওয়ায় এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন-নিবন্ধন—ক্রমশঃ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা,—পৌণ্ড্রক, দ্রবিড়, কাম্বোজ যবন, শক, চীন ইত্যাদি। স্ববর্ণবিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলেই স্বীয়জাতি হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়, পক্ষান্তরে উচ্চবর্ণোচিত গুণসম্পন্ন হইলে, উচ্চবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হওয়া যায়, ইহাই শাস্ত্রসঙ্গত।

এতাবৎকাল আমরা এ বিষয়ে প্রমাণপর্য্যালোচনা করিলাম, অধুনা দৃষ্টান্তানুসন্ধান করিব। সকলেই অবগত আছেন, গাধিরাজার পুত্র বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও, তপস্যা-বলে ব্রাহ্মণ-পদবীতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশের ১৯ অধ্যায়ে দেখিতে পাই—“অপ্রতিরথাৎ কন্বস্তস্যাপি মেধাতিথির্যতঃ কান্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ।” অপ্রতিরথ ক্ষত্রিয় ছিলেন, তৎপুত্র কন্ব, তৎসুত মেধাতিথি—তাঁহা হইতে কান্বায়ন ব্রাহ্মণকুল উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাভারতীয় হরিবংশপর্ব্বে ৩২ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়—“দিবোদাসস্য দায়াদো ব্রহ্মর্ষিঃ মিত্রয়ুর্নৃপঃ। মৈত্রায়নস্ততঃ সোমো মৈত্রেয়াস্তু ততঃস্মৃতাঃ।” ক্ষত্রিয় দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু রাজা ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মৈত্রায়ণ সোম। তাঁহা হইতে মৈত্রায়ণ ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

একই বংশে ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন জাতির উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, যেমন,—বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশের প্রথমাধ্যায়ে উল্লিখিত আছে—“করূষাৎ কারূষা মহাবলাঃ ক্ষত্রিয়া বভূবুঃ। নাভাগো নেদিষ্টপুত্রস্তু বৈশ্যতাং অগমৎ। পৃষধ্রস্তু গুরুগোবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ।” বৈবস্বত মনুর পুত্র করূষ হইতে মহাবল কারূষ ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মনুর অন্য পুত্র নেদিষ্ঠ, তৎপুত্র নাভাগ, তিনি বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুসুত পৃষধ্র গুরুর

গো-বধ করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভারতীয় হরিবংশে একাদশ অধ্যায়ে আছে—"নাভাগারিষ্ট-পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।" বৈশ্য নাভাগারিষ্টের বৈশ্য পুত্রদ্বয় ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন। বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশের অষ্টমাধ্যায়ে পরিদৃষ্ট হয়—"কাশলেশগৃৎসমদাস্ত্রয়োঽস্যাভবন্। গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তয়িতা।" সুনহোত্রের তিন পুত্র হইয়াছিল, কাশ, লেশ, গৃৎসমদ। গৃৎসমদপৌত্র শৌনক, তাঁহা হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিই উৎপন্ন হইয়াছিল। বায়ুপুরাণে আছে—"পুত্রোগৃৎসমদস্য শুনকো যস্ত শৌনকাঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ। এতদ্বংশে সমুদ্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভিঃ দ্বিজাঃ।" গৃৎসমদের তনয় শুনক, তৎসুত শৌনক, যাঁহার বংশে বিভিন্ন বিচিত্র কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণই উৎপন্ন হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত আছে,—"ধৃষ্টকেতুস্ততশ্চ বৈণুহোত্রস্ততশ্চভার্গঃ। ভার্গস্য ভার্গভূমিঃ অতশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রবৃত্তিঃ।" ধৃষ্টকেতু হইতে বৈণুহোত্র, তৎপুত্র ভার্গ, তৎসুত ভার্গভূমি, তাঁহা হইতে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। মহাভারতীয় হরিবংশে ৩২ অধ্যায়ে দেখিতে পাই,— "বৎসস্য বৎসভূমিস্ত ভার্গভূমিস্ত ভার্গবাৎ। এতে ত্বঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেঽথ ভার্গবে। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ!" বৎস হইতে বৎসভূমি, এবং ভার্গ হইতে ভার্গভূমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভার্গববংশোদ্ভূত অঙ্গিরসের পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি জাতিই হইয়াছিলেন। আরও অশেষ শাস্ত্রীয়-দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রাজা বিতথ্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্ন মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দপুরাণে দেখা যায়, পরশুরাম ধীবরগণকে ব্রাহ্মণত্ব দান করিয়া ছিলেন। দাক্ষিণাত্যবাসী অনেক ব্রাহ্মণ এই প্রকারে উৎপন্ন। ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা দেখিয়াছি, দাসী জবালার পুত্র সত্যকাম-জাবাল গণ্যমান্য ঋষির মধ্যে পরিগণিত। দাসীপুত্র হইলেও তিনি সত্যের অনুসরণ করায় ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছিলেন। সত্য ব্রাহ্মণের লক্ষণ, সুতরাং অজ্ঞাত-জন্মতত্ত্ব দাসীসুতও সত্য-মাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণত্ব অধিকার করিয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে, কবষ নামে দাসীপুত্র (শূদ্র)

ঋষিত্বলাভ করিয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়, বিদেহরাজ বরপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েন। আরও পুরাণে দৃষ্ট হয়, বীতহব্য নামক একরাজা ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টান্তে অবশ্য অবধারিণ করিতে পারি যে, গুণকর্ম্মানুসারে জাতির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সংঘটিত হইত। মহর্ষি মনু উচ্চরবে বলিয়াছেন—"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্। ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাৎ তথৈবচ।" ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় সম্বন্ধেও এরূপ সংঘটিত হইতেছে। ধর্ম্মসূত্রকার আপস্তম্ব বলিয়াছেন—"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যোবর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতি-পরিবৃত্তৌ।"১ "অধর্ম্ম-চর্য্যয়া পূর্ব্বোবর্ণো জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতি-পরিবৃত্তৌ।"২ ধর্ম্মচর্য্যাদ্বারা জঘন্য বর্ণ শ্রেষ্ঠবর্ণ প্রাপ্ত হয়, এবং যে যে বর্ণোচিতকর্ম্মসম্পন্ন হয়, সে সেই বর্ণেরই অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। আবার অধর্ম্মচর্য্যাদ্বারা উৎকৃষ্ট বর্ণ জঘন্য বর্ণ প্রাপ্ত হয়, ও তৎকর্ম্মোচিত বর্ণ মধ্যে গণনীয় হয়।

মহাভারতীয় অনুশাসনপর্ব্বের কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে, ইহাও উৎকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপে পরিগণিত হইতে পারিবে। "এভিস্তু কর্ম্মভির্দেবি! শুভৈরাচরিতৈস্তথা। শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ। এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি! ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ। শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নঃ দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ। ব্রাহ্মণোঽপি অসদ্বৃত্তঃ সর্ব্বসঙ্করভোজনঃ। ব্রাহ্মণ্যং সমমুৎসৃজ্য শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ। কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দেবি! শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মানুশাসনম্। স্বভাবঃ কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেঽপি তিষ্ঠতি। বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ। ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং। সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে। বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি। ব্রহ্মস্বভাবঃ কল্যাণি! সমঃ সর্ব্বত্র মে মতিঃ। নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ। এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রোভবেদ্দ্বিজঃ। ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্ম্মাৎ যথা শূদ্রত্বমশ্নুতে।" এতদংশের ব্যাখ্যা যথা,—এই সকল শুভকর্ম্ম ও শুভাচারের অনুষ্ঠান করিলে, শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ক্ষত্রিয়াচার-সম্পন্ন হইলে,

বৈশ্যও ক্ষত্রিয় হইতে পারেন। এই সকল উৎকৃষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে, হীনবংশজ শূদ্রও সংস্কারসম্পন্ন আগমবান্ ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। আর ব্রাহ্মণও যদি অসচ্চরিত্র এবং সকলসঙ্করের অন্নভোজী হইয়া ব্রহ্মণ্য তিরস্কার করেন, তবে তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন। কর্ম্মদ্বারা জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধান্তঃকরণ শূদ্রসন্ততিও ব্রাহ্মণের সমান বরণীয় গণনীয় হইতে পারেন, ইহাই ব্রহ্মানুশাসন। শূদ্রসন্তান যদি সৎকর্ম্মা এবং সচ্চরিত্র হন, তবে তিনি দ্বিজ অপেক্ষাও অধিক শ্রেষ্ঠ. ইহাই আমার অভিপ্রায়। সৎকুল-জন্ম, সংস্কার-সম্পত্তি, বেদাধ্যয়ন এবং ব্রাহ্মণবীর্য্যে উৎপন্ন হওয়া—এই গুলি থাকিলেই তাহাদ্বারা ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। যে চরিত্রবান্ সেই ব্রাহ্মণ। সকল স্থানেই চরিত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত আচার-ব্যবহারদ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, ইহা আমার মনোগতভাব। শূদ্রও চরিত্রবলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে। সর্ব্বত্র সমতাই ব্রহ্মভাব। যাঁহার হৃদয়ে সেই নির্ম্মল নির্গুণ ব্রহ্মভাব বিদ্যমান আছে, তিনিই যথার্থপক্ষে ব্রাহ্মণ। যেরূপে গুণোৎকর্ষে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে, এবং যেরূপে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব গ্রহণ করেন, এই অতি গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিলাম। গুণবান্ চরিত্রবান্ ই আদরণীয়, সুতরাং জাত্যাচার বিহীন হইলে, সে সে জাতির মধ্যে নহে।

সন্দিগ্ধজাতি-নির্ণয়।

আমরা এখন দেখিব, জাতিনির্ণয়-সন্দেহ উপস্থিত হইলে, মহর্ষিরা কি করিতেন? সত্যকামজাবাল-সংবাদ স্মরণ করিলে মনে হয়, গুণকর্ম্ম দর্শনে সমাধান করিতেন। মানবধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাই "প্রচ্ছন্না বা হ্যপ্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।" প্রচ্ছন্ন এবং অপ্রকাশ জাতি কর্ম্মদ্বারা চিনিতে হয়। এখানে বিবেচ্য এই যে, সর্ব্বদা কর্ম্মদ্বারা প্রকৃত জাতি নির্ণয় হয় না, কারণ ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। মনু বলেন "অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা। জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ সহ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ।"

স্বীয়বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে অক্ষম হইলে, ব্রাহ্মণ সন্নিকৃষ্ট ক্ষত্রবৃত্তি গ্রহণ করিবেন। আর যদি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এতদুভয়বৃত্তিই তাঁহার জীবিকার্জ্জনের অনুপযোগী হয়, তবে তিনি বৈশ্যবৃত্তিও গ্রহণ করিতে পারেন। এতদর্থে মনু বলেন—"উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেদ্ ভবেৎ। কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্ বৈশ্যস্য জীবিকাং।" মনু আরও বলিয়াছেন "শস্ত্রং দ্বিজাতিভির্গ্রাহ্যং ধর্ম্মো যত্রোপরুধ্যতে ইত্যাদি।" ধর্ম্মোপরোধে ব্রাহ্মণ শস্ত্র গ্রহণ করিবেন। এই সকল বিপন্নব্যবস্থা অবশ্য নিয়ম নহে, বিশেষকারণে নিয়মের ব্যভিচার মাত্র। প্রাচীনকালে ইহা জাতিনির্ণয়ে বড় বাধক হইত না, কিন্তু অধুনা বৃত্তিসাঙ্কর্য্য উপস্থিত হওয়ায়, কেবল মাত্র অধুনাতন-বৃত্তিদ্বারা জাতি স্থির হওয়া উচিত নহে। বর্ত্তমানযুগে একের জাতীয় ধর্ম্ম অপরজাতীয়-ব্যক্তি কর্তৃক আচরিত হইতে দেখা যায়। এই কারণে এবং অন্য অনেক কারণে, কর্ম্মদ্বারা জাতি চিনিতে পারা অনেকাংশে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু, আমরা বলিব যে, সকলস্থানে ইহার মৌলিকতা দূর হয় নাই। এক জাতির সমস্ত ব্যক্তিতে জাতীয়কর্ম্ম বিদ্যমান না থাকুক, কিন্তু জাতির মধ্য হইতে একেবারে প্রকৃত বর্ণানুগত কর্ম্ম লুপ্ত হওয়া অসম্ভব। ব্রাহ্মণেরা অন্যান্যবর্ণের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যাজনাদি তাঁহাদের মধ্য হইতে লুপ্ত হয় নাই, হইবেও না। অতএব জাতির প্রকৃততত্ত্ব বুঝিতে হইলে, সমগ্র জাতিটীর বা জাতীয় ব্যক্তিমণ্ডলীর আচার, ব্যবহার, কর্ম্ম ইত্যাদি ভূয়োভূয় অনুসন্ধান করিতে হইবে। বহুকালের জরাজীর্ণ জাতি-রহস্যের প্রকৃততত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করা কষ্টকর; কিন্তু শাস্ত্র ও যুক্তির সীমা অতিক্রম না করিয়া, যতদূর সম্ভব—উহানির্দ্ধারণ করা অযৌক্তিক নহে। হিন্দুজাতি সর্ব্বত্রই সত্যনিশ্চয়ে শাস্ত্র এবং যুক্তির অনুসরণ করিয়া থাকেন, জাতিতত্ত্বেও তাহাই কর্ত্তব্য।

কেবল শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিলে, অধুনা, সত্যনির্দ্ধারণ সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ শাস্ত্র বহুস্থানে প্রক্ষিপ্তশ্লোকে পরিপূর্ণ। ব্যক্তি বা সমাজবিশেষের স্বার্থজন্য উহাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে, বিকৃত হইতে হইয়াছে। অনুদার স্বার্থান্বেষিগণ সমাজের এবং শাস্ত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করায়, এই দুর্দ্দশা সমুপস্থিত

হইয়াছে। যুক্তির আলোকে, শাস্ত্রের অন্ধকার আবর্জ্জনার তলে যে সত্য নিহিত আছে, অর্থাৎ যাহা শাস্ত্রের প্রকৃততত্ত্ব, তাহাই দেখিতে হইবে। আমাদের দেশে, অমূলক কাল্পনিক কতকগুলি "ছাইভস্ম" শাস্ত্রে প্রবেশ করায় শাস্ত্র পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষেত্রে একমাত্র শাস্ত্রের আদেশ—অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রক্ষিপ্ত অন্যায্য অংশের আদেশ গ্রহণ করিয়া, যুক্তিশাস্ত্রকে পদদলিত করায়, সমাজে এক ভীষণ কুসংস্কারের বিরাট্ ছায়া পতিত হইয়াছে, এবং সত্যও অন্ধকারে প্রবেশ করিয়াছে। এই সকল কাল্পনিক কুসংস্কারের ফলে, আমরা এতদ্বিষয়ে এখন আর নিরপেক্ষভাবে যুক্ত্যানুসরণ করিতে পারিতেছি না। ইহাতে শাস্ত্রের মূল্যবান্ উদার-আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা হইতেছে। শাস্ত্রের উদারবচন—"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোঽর্থ-নির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।" যুক্তিবিহীন বিচারদ্বারা ধর্ম্ম-হানি হয়। আমরা পদে পদে ধর্ম্মহানিরূপ মহাপাপের অনুষ্ঠানে কলুষিত হইতেছি, অতএব আর উদাসীনা করিলে চলিবে না। শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়ে অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রের প্রকৃত তথ্য-নির্ণয়ে অগ্রসর হইতে হইবে।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানসময়ে বহুজাতীয় লোক বাস করিতেছেন, উঁহারা কে কোন জাতি, এটী নিরূপণ করা আবশ্যক হইয়াছে। যদিও অনধিক-কালের শাস্ত্রে, এই সকল জাতির সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে, তথাপি সে সকলের প্রতি, নানাবিধ মতবিরোধ ও অযৌক্তিকতা বশতঃ—সর্ব্বত্র আস্থা-স্থাপন করা যায় না। আমরা যদি অধুনা কোনও সম্প্রদায়-বিশেষের প্রকৃত-জাতি-নির্দ্ধারণে অগ্রসর হই, তবে আমাদিগকে কতকগুলি উপায় বা যুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। প্রথমতঃ—দেখিতে হইবে, ঐ সন্দিগ্ধসম্প্রদায়ের নরনারীর আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি কিরূপ, এবং উহা-দের দেব-দ্বিজ-শাস্ত্র-ধর্ম্মাদির প্রতি কিরূপ আস্থা? দ্বিতীয়তঃ—বৈদিক-মন্ত্র-যুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলিত দেবতা-পূজা ও শ্রাদ্ধ-বিবাহ-ব্রতাদি সেই নিয়মে প্রচলিত কিনা? আর সেই সমাজে বিবাহে কুশণ্ডিকা করা হয় কিনা? তৃতীয়তঃ সমাজের উচ্চজাতীয় ব্রাহ্মণ-গণের সহিত আলোচ্যজাতির সম্বন্ধ কিরূপ, এবং উচ্চজাতীয় জনগণ উহাদের সহিত একস্থানে পানীয়জল গ্রহণ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করেন কিনা?

চতুর্থতঃ—উঁহাদের বৃত্তি বা জীবিকা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট, এবং উঁহারা জলাচরণীয় কিনা? পঞ্চমতঃ—তজ্জাতীয় ব্যক্তিবর্গের শারীরসংস্থান এবং কথোপকথনের ভাষা আর্য্যোচিত কিনা? ষষ্ঠতঃ—তজ্জাতিমধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত কিনা, এবং তজ্জাতির বিধবারা দেশীয় ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের বিধবাদিগের আচার-ব্যবহার অনুসরণ করে কিনা? সপ্তমতঃ—ইহাদের পুরোহিতগণ সমাজে পতিত' কিনা, আর ব্রাহ্মণদিগের ধোবা, নাপিত—এজাতির বাটীতে কার্য্য করে কিনা? অষ্টমতঃ—ইহাদের সমাজের প্রাচীন এবং বর্ত্তমান অবস্থা ও পরিচয় এবং ধনসম্পত্তি—ইহাদের উৎকর্ষ প্রমাণ করে কিনা? নবমতঃ—দেশের সমাজতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিকেরা ইহাদিগকে সমাজের কোন্ স্তরে দেখিয়া আসিতেছেন। দশমতঃ—ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিমত এবং নিরপেক্ষযুক্তি অবলম্বনে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়? এই উপায়গুলি প্রধানভাবে পরীক্ষিত হইলেই, তজ্জাতির প্রকৃতরহস্য অবগত হওয়া যায়। প্রাচীন হিন্দুসমাজে রাজাভিপ্রায় একটী প্রকৃষ্ট কারণ বলিয়া মনে করা হইত, কিন্তু তৎকালেও উহাতে রাজানুগৃহীত জাতির অনুচিত শ্রেষ্ঠতা, এবং রাজাভিমত-চ্ছেদনকারী জাতির অন্যায় অধঃপতন সংঘটন হইতে পারিত। অধুনা রাজাভিমতের অধিক মূল্য নাই। রাজা বিদেশীয় বিজাতীয়, প্রকৃত-তথ্যানুসন্ধান তৎপক্ষে কষ্টকর; বস্তুতঃ জনসাধারণের বর্ত্তমান অভিমত-গ্রহণ ব্যতীত, রাজকর্ত্তৃক অন্য উপায়ও অবলম্বিত হয় নাই। সুতরাং, এখন উহা সত্য-নিশ্চয়ে প্রমাণ-স্বরূপ গৃহীত হইতে পারিতেছে না। জন-সাধারণের অভিমত—জাতিনির্ণয়ে অন্যতম কারণ, একথা অনেকে বলেন, কিন্তু জনসাধারণ প্রচলিত কুসংস্কারই মস্তকে বহন করিয়া আসিতেছে। অনুসন্ধান-দ্বারা সত্যস্থির করিয়া, অভিমত প্রকাশ করে নাই, সুতরাং জন-সাধারণের অভিমত "প্রমাণ" না হইয়া, "পরীক্ষিতব্য" হওয়াই সমধিক সঙ্গত।

জাতিতত্ত্বের জটিলতা ও সত্যানুসন্ধান।

মহামান্য বেদে চতুর্ব্বর্ণের কথা আছে। এ চতুর্ব্বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। বেদের এ অংশের উদ্দেশ্য যাহাই হউক্ অথবা এ অংশ

প্রক্ষিপ্ত বা মৌলিক হউক্, সর্ব্বথা চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত পঞ্চম-বর্ণের উল্লেখ হিন্দু-জাতির ধর্ম্ম সমাজ-শিক্ষাদীক্ষার সর্ব্বপ্রাচীন-সাক্ষী বেদে কুত্রাপি নাই। প্রকৃতপক্ষে এ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র ইত্যাদি শব্দ—বেদে যে জাতিবাচকরূপে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। শ্রুতি বা বেদের পর, স্মৃতি বা মন্বাদি ধর্ম্ম-সংহিতা আলোচনা করিলে দেখা যায়, চারিজাতি। মহর্ষি মনুর সংহিতায় দেখা যায়—"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যাস্ত্রয়োবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ, চতুর্থ এক-জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ।" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনবর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ শূদ্র একজাতি, পঞ্চম জাতি নাই। শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিতেছেন, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" চারিবর্ণের কথাই সর্ব্বত্র। প্রাচীন ইতিহাস মহাভারতেও চারিবর্ণেরই উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। অন্যান্য সকল শাস্ত্রেই চারিজাতির কথা পাওয়া যায়। আমরা অধুনা সমাজে চারিজাতি ব্যতীত আরও অনেক জাতি দেখিতে পাইতেছি।

প্রাচীন চারিজাতি এখন প্রায় চারিশতের কাছাকাছি গিয়াছে। এই বিষয়ে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রধানতঃ দ্বিবিধ মত বিদ্যমান আছে। দ্বিতীয়টী এই যে, বর্ত্তমান সমস্তজাতিই প্রাচীন চারি জাতিতে অন্তর্নিবিষ্ট হইবে। বর্ত্তমান জাতি-বহুত্ব, এক একটী জাতির অন্তর্গত লোক-সকলের মধ্যে নানাকারণে উৎপন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গত মাত্র, বস্তুতঃ পঞ্চম জাতি নাই। প্রথমটী এই যে, প্রাচীন চারিজাতির মধ্যে অনুলোম-প্রতিলোম-বিবাহ এবং ব্যভিচার সংঘটিত হইয়া, বহুবিধ জাতি সৃষ্ট হয়। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আবার এ সকল ব্যভিচারাদি হইতে, ক্রমে বর্ত্তমান জাতি-সকল উৎপন্ন হইয়াছে। পুরাণ ও ধর্ম্মসংহিতাশাস্ত্রে এই সকল জাতির উৎপত্তি বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান জাতি-সকল ঐ চারিজাতি হইতে উৎপন্ন, কিন্তু স্বতন্ত্র জাতি।

আমরা প্রথম মতের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব, তাহার অভ্যন্তরে কি পাই? সর্ব্বাগ্রে আমরা এপক্ষে একটী সুন্দর যুক্তি দেখিতে পাইতেছি, তাহা "জাতি"-শব্দের মূলরহস্য। এইমতে জন্মভেদ জাতিভেদের নিমিত্তরূপে গৃহীত হইতেছে। জাতি এবং জন্ম একই কথা। জাতি-শব্দ সংস্কৃত, উহা জন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। একজাতি অর্থাৎ যাহাদের জন্ম এক। জাতি-শব্দ "জন্ম" অর্থে

বহুপূর্ব্ব হইতে ব্যবহৃত হইতেছে, এবং উহাই উহার প্রকৃত ব্যাকরণ-সঙ্গত অর্থ। মীমাংসাদর্শনের প্রথমাধ্যায় চতুর্থপাদের চতুর্ব্বিংশতিতম সূত্র "জাতিঃ।" মীমাংসা-ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শবরস্বামী ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, 'জাতি' অর্থ জন্ম। সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক ব্যাখ্যাতা সায়নাচার্য্য অধিকরণমালায় ঐ সূত্রের তাৎপর্য্য লিখিতে, জাতি অর্থ 'জন্ম' বলিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি, জন্ম জাতির নিদান।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রিতয় দ্বিজ, দ্বিজন্মা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন, বস্তুতঃ এই শব্দ কয়টী সমানার্থ। এই শব্দের আলোচনায় বুঝা যায়, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় দুইবার জন্ম গ্রহণ করেন। একবার মাতৃগর্ভনিক্রান্তি, অন্যবার উপনয়ন-সংস্কারের সময় কৃষ্ণাজিন-গর্ত্তনিক্রমণ। গোপথ-ব্রাহ্মণাদিতে দৃষ্ট হয়, পুরাকালে উপনয়নের সময় বালক গর্ত্তবাসী শিশুর মত ভাবে কৃষ্ণাজিনের উপর উপবেশন করিত, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণাজিনদ্বারা আবৃত করিয়া দেওয়া হইত। পরে তাহাকে ঐ কৃষ্ণাজিনগর্ত্ত হইতে বহির্গত করিয়া, তাহার দ্বিতীয়জন্মের চিহ্ন কৃষ্ণাজিন (নাড়ীস্বরূপ) গলে দেওয়া হইত। উহাই যজ্ঞোপবীত। জাত শিশুদের গলদেশে, অনেক সময়ে যজ্ঞোপবীতের মতভাবে নাড়ীবেষ্টন থাকিতে দেখা যায়। ক্রমে কৃষ্ণাজিন-আবরণ এবং কৃষ্ণাজিন-যজ্ঞোপবীতের স্থানে বস্ত্রাবরণ ও সূত্র-যজ্ঞোপবীত (যজ্ঞসূত্র) উপস্থিত হইয়াছে। অদ্যাপি বস্ত্রগর্ভে উপনেতব্য বালক ক্ষণকাল অবস্থিতি করে, দেখা যায়। জাতি-শব্দের সহিত জন্মের যখন এত সন্নিকর্ষ, তখন বর্ত্তমান জাতিগুলিকে পৃথক্ জাতি না বলিলে চলিবে কেন? পুরাণাদি গ্রন্থে দেখা যাইতেছে, এই সকল জাতির উৎপত্তি বিভিন্নরূপ। যথা—অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তি যেরূপ, চণ্ডালজাতির উৎপত্তি অর্থাৎ জন্ম সেরূপ নহে। প্রথমোক্তের পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা বৈশ্যকন্যা, শেষোক্তের মাতা ব্রাহ্মণী, পিতা শূদ্র, সুতরাংই উভয়ে ভিন্নজাতি। ইহার যে কোনও একটী প্রকারে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের পিতা-মাতা একরূপ—অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত-প্রকারের কোনও একটীর মত হওয়ায়, তাহারা একই জাতি হইয়াছে। যখন শাস্ত্রে দেখা যাইতেছে, ইহাদের উৎপত্তি বিভিন্ন, আর জাতিশব্দের আলোচনায় বুঝা গিয়াছে, উৎপত্তি বা জন্মভেদেই জাতিভেদ,

তখন অবশ্যই বলা যাইবে, এই সকল জাতি কখনই চতুর্ব্বর্ণের অন্তঃপাতী নহে। কোন্ জাতি কোন্ রূপে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা পুরাণ-সংহিতাদিতে যথেষ্ট পরিমাণে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে তাহার বিস্তার-উল্লেখ আবশ্যক বোধ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা আর একটী যুক্তি ইহাতে দেখিতে পাইব, একজাতীয় লোক একবর্ণ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বর্ণ অর্থ রঙ্। একজাতীয় লোক-সকলের শরীর-বর্ণ এক হইবার কারণ—তাহাদের জন্ম একরূপ। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে আছে, "ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতঃ। বৈশ্যানাং পীতকোবর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা।" ব্রাহ্মণের গাত্রবর্ণ শ্বেত, ক্ষত্রিয়ের লোহিত, বৈশ্যের পীত এবং শূদ্রের কৃষ্ণ। এই সকল বিভিন্নবর্ণধারী ব্যক্তি কখনই একবংশজাত নহে। স্থানীয় জল-বায়ুর প্রকৃতি ও আহার-পরিচ্ছদাদির বিভিন্নতা অনুসারে শারীরবর্ণের কথঞ্চিৎ বিভিন্নতা ঘটিতে পারে, কিন্তু মূলতঃ শুক্রশোণিত-সম্বন্ধই বর্ণপার্থক্যের মূল-কারণ। আমরা কাশ্মীরি-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে, ভারতীয় আর্য্যজাতির প্রকৃত বর্ণ দেখিতে পাই। অন্য সকল প্রদেশীয়দের বর্ণই অন্য-শোণিত-সম্বন্ধে বিকৃত হইয়াছে, ইহাও দেখিতে পাই; সুতরাং জন্মকে বর্ণের কারণ বলিতে পারি।

জগতে লোহিত ও পীতবর্ণের মানব এখনও অনেক বিদ্যমান, ভারতীয় সমাজের চারিজাতিতেও ঐ ভাব ছিল। কিন্তু পরে, শুক্রশোণিতের সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হওয়ায়, বর্ণ বিকৃত হইয়াছে। প্রাচীনকালের মৌলিক চারিজাতি সম্বন্ধে, শাস্ত্রে যেমন বর্ণভেদ-মূলক জন্মভেদ দৃষ্ট হয়, এ সকল জাতি-সম্বন্ধেও তদ্রূপ বলা যাইতে পারে। অল্লাধিক পরিমাণে উহাতে বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছে, এবং দেশের জলবায়ুর প্রকৃতিতে উহার অনেকটা ব্যতিক্রম হইয়াছে; তথাপি যে সকল জাতির উৎপত্তি শাস্ত্রে যত নিকৃষ্ট, তাহাদের বর্ণও তত নিকৃষ্ট, এরূপ দেখা যায়। সামান্য-ব্যতিক্রম আজি কালি দুর্লক্ষ্য হইয়া উঠিলেও, অপেক্ষাকৃত উচ্চজাতির সহিত অত্যন্ত নীচজাতির বর্ণসাদৃশ্য প্রায় আদৌ নাই, ইহা দেখা যায়। অতএব ইহারা ভিন্ন জাতি। পুরাণাদিতে জাতিসকলের উৎপত্তিসম্বন্ধে যদ্রূপ লিখিত

হইয়াছে, তাহার কতকগুলি মূল শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি। যথা—

মনু স্পষ্ট বলিয়াছেন—

লোকানাং তু বিবৃদ্ধার্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥

লোক বৃদ্ধির জন্য প্রজাপতি স্বীয় মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মনু আরও বলিতেছেন,—

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রোনাম প্রজায়তে॥
ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যাৎ মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ॥
শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমোনৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥
একান্তরেত্বানুলোম্যাদম্বষ্ঠোগ্রৌ যথাস্মৃতৌ।
ক্ষত্তৃবৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যেঽপি জন্মনি॥
ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতোনাম জায়তে।
আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়ামায়োগব্যাং তু ধিগ্বণঃ॥
আয়োগবশ্চ ক্ষত্তা চ চণ্ডালশ্চাধমোনৃণাম্।
প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ॥
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ ক্ষত্রিয়াৎ সূত এবতু।
প্রতীপমেতে জায়ন্তে পরেঽপ্যপসদাস্ত্রয়ঃ॥
জাতো নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাত্যা ভবতি পুক্কশঃ॥
শূদ্রাজ্জাতো নিষাদ্যাং তু স বৈ কুক্কুটকঃস্মৃতঃ।
ক্ষত্তুর্জাতস্তথোগ্রায়াং শ্বপাকইতি কীর্ত্তিতঃ॥
বৈদেহকেনাম্বষ্ঠ্যায়ামুৎপন্নো বেণ উচ্যতে।
দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্॥

তান্ সাবিত্রী-পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যানিতি বিনির্দ্দিশেৎ।
ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টকঃ॥
ঝল্লমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যাল্লিচ্ছবিরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচ॥
বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এবচ।
কারুষশ্চ বিজন্মাচ মৈত্রসাত্বত এবচ॥
সূতো বৈদেহকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ।
মাগধঃ ক্ষত্তৃজাতিশ্চ তথায়োগব এবচ॥

হারীতসংহিতায় দেখা যায়—

বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তস্তু ক্ষত্রিয়ায়ামজায়ত,
বৈশ্যায়ান্তু তথাম্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্রয়া তথা।
রাজন্যাদ্ বৈশ্যশূদ্র্যোস্তু মাহিষ্যোগ্রৌ তু তৌ স্মৃতৌ।
শূদ্র্যাং বৈশ্যাত্তু করণ এত এবানুলোমজাঃ।
বিপ্রায়াং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ বৈশ্যাদ্বৈদেহকস্তথা
চণ্ডালস্তু তথা শূদ্রাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ।
মাগধঃ ক্ষত্রিয়ায়াং বৈ বৈশ্যাৎ ক্ষত্তা তু শূদ্রতঃ
শূদ্রাদায়োগবং বৈশ্যা জনয়ামাস বৈ সুতম্।
রথকারঃ করণ্যাস্তু মাহিষ্যেণ প্রজায়তে,
অসৎ-সন্ততয়ো জ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
প্রতিলোমাসু বৈ জাতা গর্হিতাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥

"বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে" জাত্যুৎপত্তি-প্রক্রিয়া যথা—

শূদ্রায়াং বৈশ্যতোজজ্ঞে করণোনাম সঙ্করঃ।
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠোঽথ গান্ধিকো বণিক্।
কাংসাকারঃশঙ্খকারো ব্রাহ্মণাৎ সংবভূবতুঃ।
উগ্রশ্চ রাজপুত্রশ্চ তস্যাং ক্ষত্রাৎ বভূবতুঃ॥
কুম্ভকারশ্চ দাসশ্চ শূদ্রাৎ তস্যাং বভূবতুঃ॥
কর্ম্মকারশ্চ দাসশ্চ শূদ্রাৎ তস্যাং বভূবতঃ॥
বৈশ্যাদ্বভূব ভূরঙ্গো মাগধো গোপ এব চ।
ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়াং জাতৌ নাপিতমোদকৌ॥

ব্রাহ্মণাৎ শূদ্রকন্যায়াং বারুজীবী বভূবহ।
ব্রাহ্মণাং ক্ষত্রিয়াৎ সুতো মালাকারস্তথা মুনে॥
বৈশ্যাত্তু দ্বিজকন্যায়াং জাতৌ তাম্বুলিতৈলিকৌ।
বিংশতিঃ সঙ্করা এতে জাবালে কথিতাস্তব॥
উত্তমাঃ সঙ্করা এতে মধ্যমাধময়োঃ শৃণু।
বৈশ্যায়াং করণাজ্জাতৌ তক্ষা রজক এব চ॥
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ তস্যামম্বষ্ঠসম্ভবৌ।
বৈশ্যায়াং গোপতোজাতৌ আভীরতৈলকারকৌ।
গোপাৎ শূদ্রসা কন্যায়াং জাতৌ ধীবরশৌণ্ডিকৌ
মালাকারাজ্জসম্ভূতৌ নটঃ শাবক এবচ॥
মাগধাদপি শূদ্রায়াং জাতৌ শেখরজালিকৌ।
এতে বৈ মধ্যমাঃ প্রোক্তা অন্ত্যজানপি মে শৃণু॥
বৈশ্যপত্ন্যাং স্বর্ণকারাৎ মলেগ্রহিরজায়ত।
কুড়বঃ স্বর্ণবণিজো বৈশ্যপত্ন্যাং বভূবহ॥
শূদ্রাচ্চ ব্রাহ্মণীগর্ভাচ্চণ্ডালস্য চ সম্ভবঃ।
আভীরাদ্গোপকন্যায়াং বরূড়ঃ সমজায়ত॥
তক্ষোঽভূদ্বৈশ্যকন্যায়াং চর্ম্মকারশ্চ শিল্পবিৎ।
ঘটজীবীতু রজকাদ্বৈশ্যায়াং সংবভূবহ॥
বৈশ্যায়াঞ্চ তৈলকারাদ্দোলাবাহী বভূবহ।
ধীবরাদপি শূদ্রায়াং মল্লজাতির্বভূবহ॥
ইত্যাদয়ো হ্যন্ত্যজাঃ প্রোক্তা বর্ণাশ্রমবহিষ্কৃতাঃ
ষট্‌ত্রিংশজ্জাতিকর্ম্মাণি সাধকাঃ কথিতাস্তব।

*　　*　　*　　*

দেবলাদ্গণকো জাতো বৈশ্যায়াং বাদকোঽপিচ।
বেণস্যাঙ্গাত্তু সম্ভূতো ম্লেচ্ছো নাম সুতোঽবরঃ,
পুলিন্দঃ পুক্কশশ্চৈব খসো বৈ যবনস্তথা।
শুহ্মকাম্বোজশবরাঃ খরশ্চেত্যাদয়ঃ সুতাঃ।

বিংশতি-সংহিতাকারের অন্যতম উশনা জাতি সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি জাতিবৃত্তবিধানকং
অনুলোমবিধানঞ্চ প্রতিলোমবিধিস্তথা।
সান্তরালকসংযুক্তং সর্ব্বং সংক্ষিপ্য চোচ্যতে॥
নৃপাদ্ ব্রাহ্মণকন্যায়াং বিবাহেষু সমন্বয়াৎ,
জাতঃ সূতোঽত্র নির্দ্দিষ্টঃ প্রতিলোমবিধের্দ্বিজঃ।
বেদানর্হস্তথা চৈষাং ধর্ম্মানামনুবোধকঃ।
সূতাদ্বিপ্রপ্রসূতায়াং সুতো বেণুক উচ্যতে।
নৃপায়ামেব তস্যৈব জাতো যশ্চর্ম্মকারকঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রসংসর্গাজ্জাতশ্চণ্ডাল উচ্যতে।
চণ্ডালাদ্বৈশ্যকন্যায়াং জাতঃ শ্বপচ উচ্যতে।
নৃপায়াং বৈশ্যসংসর্গাদায়োগব ইতি স্মৃতঃ।
আয়োগবেন বিপ্রায়াং জাতাস্তাম্রোপজীবিনঃ।
তস্যৈব নৃপকন্যায়াং জাতঃ সূণিক উচ্যতে,
সূণিকস্য নৃপায়ান্তু জাতা উদ্বন্ধকাঃ স্মৃতাঃ।
নৃপায়াং বৈশ্যতশ্চৌর্য্যাৎ পুলিন্দঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
নৃপায়াং শূদ্রসংসর্গাজ্জাতঃ পুক্কশ উচ্যতে॥
পুক্কশাদ্বৈশ্যকন্যায়াং জাতো রজক উচ্যতে।
নৃপায়াং শূদ্রতশ্চৌর্য্যাজ্জাতো রঞ্জক উচ্যতে॥
বৈশ্যায়াং রঞ্জকাজ্জাতো নর্ত্তকো গায়কো ভবেৎ।
বৈশ্যায়াং শূদ্রসংসর্গাজ্জাতো বৈদেহকঃ স্মৃতঃ॥
বৈদেহকাত্তু বিপ্রায়াং জাতাশ্চর্ম্মোপজীবিনঃ।
নৃপায়ামেব তস্যৈব সূচিকঃ পাচকঃ স্মৃতঃ॥
বৈশ্যায়াং শূদ্রতশ্চৌর্য্যাজ্জাতশ্চক্রী স উচ্যতে।
বিধিনা ব্রাহ্মণঃ প্রাপ্য নৃপায়ান্তু সমন্ত্রকম্॥
জাতঃ সুবর্ণইত্যুক্তঃ আনুলোম্যাৎদ্বিজঃ স্মৃতঃ।
নৃপায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ সংজাতোঽভিষকঃ স্মৃতঃ॥

নৃপায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো নৃপ ইতি স্মৃতঃ।
নৃপায়াং নৃপসংসর্গাৎ প্রমাদাদ্‌ গূঢ়জাতকঃ ॥
সোঽপি ক্ষত্রিয় এব স্যাদভিষেকে চ বর্জ্জিতঃ।
অভিষেকং বিনা প্রাপ্য গোপ ইত্যভিধায়কঃ ॥
বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোঽম্বষ্ঠঃ স উচ্যতে।
বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ কুম্ভকারঃ স উচ্যতে ॥
কুলালবৃত্ত্যা চ জীবেৎ নাপিতা বা ভবন্ত্যতঃ।
সূতকে প্রেতকে চাপি দীক্ষাকালেঽথ বাপনম্।
নাভেরূর্দ্ধন্তু বপনং তস্মান্নাপিত উচ্যতে।
কায়স্থ ইতি জীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ ॥
কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথকৃন্তনম্।
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥
শূদ্রায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতঃ পারশবো মতঃ।
তস্যাং বৈ চৈবশো বৃত্ত্যা নিষাদো জাত উচ্যতে।
নৃপাজ্জাতোঽথ বৈশ্যায়াং গৃহ্যায়াং বিধিনা সুতঃ।
তস্যাং তস্কর চৌরেণ মণিকারঃ প্রজায়তে,
শূদ্রস্য বিপ্রসংসর্গাজ্জাত উগ্র ইতি স্মৃতঃ।
তস্যৈবাগাবসদ্বৃত্ত্যা জাতঃ শুণ্ডিক উচ্যতে।
শূদ্রায়াং বৈশ্যসংসর্গাদ্বিধিনা সূচকঃ স্মৃতঃ।
সূচকাদ্বিপ্রকন্যায়াং জাতস্তক্ষক উচ্যতে।
নৃপায়ামেব চৈতস্য জাতো যো মৎস্যবন্ধকঃ।
শূদ্রায়াং বৈশ্যতশ্চৌর্য্যাৎ কটকার ইতি স্মৃতঃ।
বশিষ্ঠশাপাৎ ত্রেতায়াং কেচিৎ পারশবাস্তথা ॥
বৈখানসেন কেচিত্তু কেচিদ্ভাগবতেন চ।
বেদশাস্ত্রাবলম্বাস্তে ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥

পদ্মপুরাণ-মতে জাতির উৎপত্তি যথা;—

কুলটায়াঞ্চ শূদ্রায়াং চিত্রকারস্য বীর্য্যতঃ।
বভূবাট্টালিকাকারঃ পতিতো জারদোষতঃ ॥

অট্টালিকাকৃদ্বীর্য্যেণ কুম্ভকারস্য যোষিতঃ।
বভূব কোটকঃসদ্যঃ পতিতো গৃহকারকঃ॥
কুম্ভকারস্য বীর্য্যেণ সদ্যঃ কোটকযোষিতঃ।
বভূব তৈলকারশ্চ কুটিলঃ পতিতো ভূবি॥
সদ্যঃক্ষত্রিয়বীর্য্যেণ রাজপুত্রস্যযোষিতঃ।
বভূব পতিতো দস্যুঃ লেটশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
লেটস্তীবরকন্যায়াং জনয়েৎষটসুতান্ ক্রমাৎ।
মালং মল্লং মাতরঞ্চ ভড়ং কোলং কলন্দরং॥
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রবীর্য্যেণ পতিতো জারদোষতঃ।
সদ্যো বভূব চাণ্ডালঃ সর্ব্ববর্ণাধমোঽশুচিঃ॥
তীবরেণচ চাণ্ডাল্যাং চর্ম্মকারো বভূবহ।
চর্ম্মকার্য্যাঞ্চ চাণ্ডালাৎ মাংসচ্ছেদী বভূবহ॥
মাংসচ্ছেদ্যাং তীবরেণ কোচশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কোচস্ত্রিয়াস্তু কৈবর্ত্ত্যাৎ কাণ্ডারঃপরিকীর্ত্তিতঃ॥
সদ্যশ্চণ্ডালকন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ শৌনক!
বভূবতুস্তৌ দ্বৌ পুত্রৌ দুষ্টৌ হড্ডিডম্মৌ তথা।
ক্রমেণ হড্ডিকন্যায়াং সদ্যশ্চণ্ডালবীর্য্যতঃ।
বভূবুঃ পঞ্চ পুত্রাশ্চ দুষ্টা বনচরাশ্চ তে।
তীবরস্য চ কন্যায়াং দ্বিজবীর্য্যেণ শৌনক!
বভূব সদ্যঃ সন্তানো গঙ্গাপুত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ—
বভূব বেশধারী চ পুত্রো যোগী প্রকীর্ত্তিতঃ।
বৈশ্যাত্তীবরকন্যায়াং সদ্যঃ শুণ্ডী বভূবহ।
শুণ্ডিযোষিতো বৈশ্যাত্তু পৌণ্ড্রকশ্চ বভূবহ॥
ক্ষত্রাৎ করণকন্যায়াং রাজপুত্রো বভূবহ।
রাজপুত্র্যাস্তু করণাদাগুরীতি প্রকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ তীবরসংসর্গাদ্ধীবরঃ পতিতো ভুবি।
তীবর্য্যাং ধীবরাৎ পুত্রো বভূব রজকঃ স্মৃতঃ।

স্বজক্ন্যাং তীবরাচ্চৈব কোদালীতি বভূবহ ॥
নাপিতাদ্ গোপ-কন্যায়াং সর্ব্বস্বী তস্য যোষিতঃ।
ক্ষত্রাদ্ বভূব ব্যাধশ্চ বলবান্ মৃগহিংসকঃ।
তীবরাৎ শুণ্ডিকন্যায়াং বভূবুঃ সপ্ত পুত্রকাঃ।
তে কলৌ হড্ডিসংসর্গাদ্বভূবুর্দস্যবঃ সদা।
ব্রাহ্মণ্যাং ঋষিবীর্য্যেণ ঋতোঃ প্রথম-বাসরে।
কুৎসিতশ্চোদরে জাতঃ কুদরস্তেন কীর্ত্তিতঃ।
তদশৌচং বিপ্রতুল্যং পতিত ঋতুদোষতঃ।
সদ্যঃ কোটিকসংসর্গাদধমো জগতীতলে।
ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং ঋতোঃ প্রথমবাসরে।
জাতঃ পুত্রো মহাদস্যুর্বলবাংশ্চ ধনুর্দ্ধরঃ।
আকারেণ তথা বাচা হ্যতীতঃ ক্ষত্রিয়ং যতঃ,
তেন জাতো সপুত্রশ্চ বাগতীতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ক্ষত্র-বীর্য্যেণ শূদ্রায়ামৃতুদোষেণ পাপতঃ।
বলবন্তো দুরন্তাশ্চ বভূবুর্ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
অবিদ্ধকর্ণাঃ ক্রূরাশ্চ দুর্দ্ধর্ষা ধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ।
শৌচাচারবিহীনাশ্চ নির্ভয়া বলদুর্জ্জয়াঃ।
ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দকন্যায়াং জোলাজাতির্বভূব হ।
জোলাৎ কুবিন্দকন্যায়াং সরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতঃ।
বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবু র্বহবো জনাঃ ॥
তে চ গ্রাম্যগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধপরায়ণাঃ।
তেভ্যশ্চ জাতয়ঃ শূদ্রাস্তে ব্যালগ্রাহিণো ভুবি ॥
বিপ্রস্তু জ্যোতির্গণনাদ্বেতনাচ্চ নিরন্তরং।
বেদধর্ম্মপরিত্যক্তো বভূব গণকো ভুবি ॥
লোভী বিপ্রশ্চ শূদ্রানামগ্রে দানংগৃহীতবান্।
গ্রহণে মৃতদানানামগ্রদানী বভূব সঃ ॥
কশ্চিৎপুমান্ ব্রহ্মযজ্ঞে যজ্ঞে কুণ্ডাৎসমুত্থিতঃ।
সস্যুতো ধর্ম্মবক্তা চ মৎপূর্ব্বপুরুষঃ স্মৃতঃ ॥

পুরাণং পাঠয়ামাস তঞ্চ ব্রহ্মা কৃপানিধিঃ।
পুরাণপ্রবক্তাচৈব স যজ্ঞকুণ্ডসম্ভবঃ॥
বৈশ্যায়াং সুতবীর্য্যেণ পুমানেকো বভূব হ।
স ভট্টো বান্ধুকশ্চ সর্ব্বেষাং স্তুতিপাঠকঃ॥

মতান্তরে কয়টী জাতির উৎপত্তি-প্রকার প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—

পট্টিকারশ্চ মালিন্যাং স্থপতিশ্চ বভূব হ।
স্থপতেরপি গন্ধিক্যাং চিত্রকারোঽপ্যজায়ত॥
গোপালিন্যাং চিত্রকারাৎপ্রতিমাগঠকঃ স্মৃতঃ।
প্রতিমাগঠকাদেব কন্যায়াং নাপিতস্য চ॥
সূত্রধারস্য সন্তানঃ সোপানগৃহকারকঃ॥
করণস্ত্রিয়াঞ্চ মাহিষ্যাদ্ রথকারস্য সম্ভবঃ।
সরাক্যাং স্থপতেশ্চাপি স্বর্ণকারস্য সম্ভবঃ॥
স্বর্ণকারচ্চ কৈবর্ত্তঃ কুবেরিণ্যাং বভূব হ।
ততো গান্ধিককন্যায়াং কৈবর্ত্তাদেব শুণ্ডিকাঃ॥
শৌণ্ডিক্যাং শরাকাজ্জাতো রজকো মলনাশকঃ।
শৌণ্ডিক্যাং রজকাজ্জাতো নটোগরুড় এবচ॥
গরুড়ান্নটকন্যায়াং শৃঙ্গকারস্য সম্ভবঃ।
শৃঙ্গকার্য্যাং নটাজ্জাতো গণিত্রামীতি বিশ্রুতঃ॥
তস্য পুত্রাৎ শৃঙ্গকার্য্যাং-ভূমিমালীতি বিশ্রুতঃ।
অনয়োর্হ্যভবৎ পুত্রঃ পুণ্ডকশ্চ তথৈবচ॥
বন্ধকারাঙ্গকাকার-কাচকারক-চক্রিকঃ।
এতে বৈ পুণ্ডকাজ্জাতাঃ কন্যায়াং নাপিতস্য চ॥
চক্রিক্যাং গঙ্গাপুত্রোঽপি কন্যায়াং পুণ্ডকস্য চ।
গঙ্গাপুত্রাৎ পুণ্ডজীবী নটকন্যা-সমুদ্ভবঃ॥
পুণ্ডজীবাদ্ গণ্ডকারো রজক-কন্যা-সম্ভবঃ।
গণ্ডকারাদ্ বাদ্যকার-বর্দ্ধকানাঞ্চ সম্ভবঃ॥
পুণ্ড্রজীবাদ্ ভড়জাতির্নট্যাং বৈ শববাহকঃ।
ভড়াত্তু চূর্ণকারো বৈ জাদরস্তীবরস্তথা,

কপালী চর্ম্মকারশ্চ কুরাবসরবৌ তথা,
পুলিন্দো মেরুবিন্দশ্চ শুন্দো মল্লস্তথাবকঃ।
কুন্দকারঃ কর্ণিকারো তোখলোহমৃতপস্তথা,
এতে বৈ তীবরাজ্জাতাঃ কন্যায়াং ব্রাহ্মণস্য চ ॥
ব্রাহ্মণ্যাং বৃষলাদেব চণ্ডালস্য চ সম্ভবঃ,
চত্বারিংশৎ পঞ্চমাসু জাতাঃ পুত্রা বিলোমজাঃ ॥

এই সমস্ত প্রমাণ পূর্ব্বমত সমর্থন করে।

অতঃপর দ্বিতীয় মতটীর আলোচনা করা যাউক্। এ পক্ষে প্রথম কথা এই যে, পুরাণসংহিতাদিতে যাদৃশ জাত্যুৎপত্তি বলা হইয়াছে, তাহার সহিত সত্যের কোনও সংশ্রব নাই। ঐ সকল শ্লোকপ্রক্ষিপ্ত, এবং পরবর্ত্তি-অজ্ঞসমাজের কল্পনা মাত্র, বস্তুতঃ উহা অত্যন্ত হাস্যাস্পদ।

প্রথম দেখা যাইতেছে, প্রাচীন শাস্ত্রে 'জাতি' শব্দ নাই, 'বর্ণ' শব্দ আছে। জাতি-শব্দ পরবর্ত্তিগণ-কর্ত্তৃক অর্থাৎ 'জন্মানুসারে জাতি-বিভাগ হয়', এই মত-প্রচারকগণ-কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করা যায়। জাতি-শব্দের সহিত জন্মের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু উহা শুক্রশোণিত-সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হয় নাই। প্রথম দ্বিজাতিদিগের দ্বিতীয়-জন্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক্। সেখানে 'জন্ম' মুখ্য নহে গৌণ। জ্ঞানানুশীলন ও চারিত্রিক উৎকর্ষই সেখানে প্রকৃত পক্ষে 'জন্ম' শব্দের লক্ষ্য। উপনয়নের পূর্ব্বে আহার-ব্যবহার-আচারাদির যথেচ্ছতা থাকে। শাস্ত্রে "প্রাগুপনয়নাৎ কামচারবাদভক্ষাঃ" দেখা যায়। উপনয়ন হইতে ঐ যথেচ্ছাচারের নিবৃত্তি হইয়া, বেশ সুন্দর শিক্ষা, সংযম, নীতিপরতা ইত্যাদিদ্বারা জীবন নিয়মিত হইতে আরম্ভ হয়। এই পরিবর্ত্তন এত লক্ষ্য করিবার জিনিষ—যে উহাকে শাস্ত্রকারগণ আবার 'জন্ম'-গ্রহণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মৌলিক চারিজাতির তিন জাতির সম্বন্ধে প্রযুক্ত 'দ্বিজ' শব্দে—অবশ্যই 'জন্ম' অর্থে—শুক্রশোণিত সম্বন্ধকে প্রধান-রূপে গ্রহণ করা হয় নাই। যদি তাহাই হইত, তবে একই পিতা-মাতার সন্তান হইয়া, কর্ম্মানুসারে ভিন্নজাতি হইতে পারিবে কেন? তাহাদের জন্ম ত একই প্রকার। বিষ্ণুপুরাণে দৃষ্ট হয়, শৌনকের পুত্রগণ

চারিজাতি হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে দৃষ্ট হয়, ভার্গভূমি হইতে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল।

গুণকর্ম্মই জাতিভেদের প্রকৃত কারণ। চারিজাতির পৃথক্ গুণ ও কর্ম্মের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানজাতি-সকলের কর্ম্ম ঐ চারিজাতির কর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে ভিন্ন-দ্রব্যের বণিক্‌গণ ভিন্ন-জাতি বলিয়া গণ্য হইতেছেন, কিন্তু সত্যপক্ষে তাঁহারা সকলেই বণিক্ বা বৈশ্যজাতির ভিন্ন শাখা মাত্র। বিভিন্নরূপ-জন্ম-হেতুক বিভিন্ন জাতির আবির্ভাব-বাদীরা জাতিভেদের তিনটী কারণ মাত্র উল্লেখ করেন, অনুলোমবিবাহ, প্রতিলোমবিবাহ, ব্যভিচার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন জাতির মধ্যে পূর্ব্বে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, শাস্ত্রে ইহার অসংখ্য প্রমাণ আছে, বস্তুতঃ ইহা সাধারণের সম্মত মত। যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করেন, তবে তাহা অনুলোম এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিলে, তাহাকে প্রতিলোম বিবাহ বলা যায়। অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণের পুরুষ অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে, অনুলোম এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের পুরুষ অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে, তাহা প্রতিলোম। অবৈধ সংসর্গজাত সন্তান সঙ্কর।

এই ত্রিবিধ উপায়ে, বহুবর্ষে, চারি মৌলিক জাতি হইতে বহুজাতি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই তাঁহাদের মত। এখানে এই বলা যাইতে পারে, এই সকল উপায়ে স্বতন্ত্র জাতির উৎপত্তি অসম্ভব। অসবর্ণ-বিবাহ যখন শাস্ত্র এবং সমাজের অনুমোদিত ছিল, তখন তদুপায়ে উৎপন্ন সন্তানেরা হয় পিতার, নয় মাতার বর্ণ হইতেন। নানাবর্ণ উৎপাদনের ইচ্ছায় অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত হওয়া সম্ভব নয়। স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নেপালে এখনও অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত আছে; কই তাহা হইতে ত প্রতিবৎসর ২। ৪ টী নূতন জাতির আবির্ভাব দেখিতেছিনা?

শাস্ত্রানুমত অসবর্ণ-বিবাহের ফলে যে প্রাচীনকালেও স্বতন্ত্র জাতির উৎপত্তি হয় নাই, তাহা আমরা পুরাণাদিতে দেখিতে পাই। পুরাণ-প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় রাজা যযাতি, ব্রাহ্মণতনয়া দেবযানীর পাণিগ্রহণ করেন, অবশ্য ইহা প্রতিলোম-বিবাহ। দেবযানীর গর্ভজাত সন্তানেরা নূতন জাতি হন

নাই, ক্ষত্রিয়ই ছিলেন, ইহা পুরাণে আছে। হারীত-সংহিতার মতে "বিপ্রায়াং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ" অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বিপ্রকন্যার গর্ভজাত সন্তান 'সূত' জাতি হইবে,—কিন্তু বস্তুতঃ এখানে তাহা হইল না। উশনা, মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারের মতে ও ঐজাতি 'সূত'—কিন্তু যথার্থতঃ সেরূপ ঘটে নাই। মান্য মুনি পরাশর, সত্যবতী-নাম্নী ধীবরতনয়ার গর্ভে যে সন্তান উৎপাদন করেন, তিনিই জগন্মান্য মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস; তিনি ব্রাহ্মণই হইয়াছিলেন, অন্যজাতি হন নাই। মুনি সৌভরি ক্ষত্রিয়-রাজার কতকগুলি কন্যা-বিবাহ করেন, সন্তানেরা অবশ্য অন্য জাতি হয় নাই। অধিক কি, বেশ্যাগর্ভে যে সকল ব্যক্তি সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সন্তানগণও অন্যজাতি হয় নাই, পিতৃ-জাতি হইয়াছে। পুরাণের এই সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া, গ্রন্থ-কলেবর বর্দ্ধিত করিব না। বস্তুতঃ অসবর্ণ-বিবাহ (প্রতিলোম ও অনুলোম) হইতে ভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি অসম্ভব।

তারপর ব্যভিচার, ইহা কখনও জাতির উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, যদি সধবা নারী ব্যভিচারিণী হয়, এবং অন্যজাতির সংসর্গে গর্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করে, তাহার পুত্র অবশ্যই মাতার, বা তাহার স্বামীর জাতি পাইবে। এখনও কি ব্যভিচার-জাত-সন্তান মিলেনা? কিন্তু কই ভিন্ন-জাতি হইতে ত দেখি না! সত্য বলিতে হইলে, কেহ কখনও সমাজকে বা শাস্ত্রকারগণকে দেখাইয়া ব্যভিচার করিত না, এবং ব্যভিচার-জাত সন্তানের গোপনীয় জনকের সংবাদ কেহ লিখিয়া রাখিত না, যে, তাহাদ্বারা জাতির নির্ণয় হইবে! এ সকল কাল্পনিক। দ্বিতীয়তঃ—যদি বিধবা স্ত্রী ব্যভিচারদ্বারা সন্তানলাভ করে, সে অবশ্য সমাজের ভয়ে তাহাকে হত্যা করিবে। নীচ-জাতির মধ্যে, যদ্যপি কোনও কোনও সময় ঐরূপ সন্তান জীবিত রাখিতে দেখা যায়, তথাপি তাহা স্বতন্ত্র জাতি হইতে পারে না।

আর একটী কথা এই যে—গণনায় জানা যায়, মূল-জাতি অপেক্ষা মিশ্রজাতীয় লোকের সংখ্যা অত্যধিক; ইহা কি এ সিদ্ধান্তের প্রতিকূল নহে? ব্যভিচারাদিদ্বারা সন্তানোৎপাদন কদাচিৎ হয়।

তাহা হইতে এত অধিকসংখ্যক-ব্যক্তি-পূর্ণ জাতির আবির্ভাব অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'চণ্ডাল' জাতি গ্রহণ করা যাউক্, শাস্ত্রে আছে "ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রসংসর্গাজ্জাতঃ চণ্ডাল উচ্যতে।" ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে চণ্ডাল-জাতি উৎপন্ন হয়। এই জাতির লোকসংখ্যা যথেষ্ট, কিন্তু এই জাতি বঙ্গ ব্যতীত—ভারতের অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি বলা যায়, ব্রাহ্মণীরা ব্যভিচারিণী হইয়া এই জাতি উৎপন্ন করিয়াছেন, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে—কেবল বঙ্গীয় ব্রাহ্মণীগণের শূদ্রসংসর্গ কি একচেটীয়া ছিল? বঙ্গের ব্রাহ্মণ-সংখ্যা ও এই জাতির ব্যক্তিসংখ্যার অনুপাত গ্রহণ করিলে—মনে হইবে, একসময়ে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের প্রায় প্রতিগৃহে শূদ্রেরা ব্যভিচার করিতে পাইত! বংশবৃদ্ধি অবশ্য উভয়কুলেই হইয়াছে। কিন্তু, এরূপ অবৈধ-সংসর্গ প্রায় ঘরে ঘরে হওয়া কি সম্ভব? যদি তাহাও স্বীকার করা যায়, তথাপি বঙ্গে প্রতিঘরে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে একটীও নয়, ইহার অর্থ কি? এরূপ অবৈধকল্পনার সমর্থক শাস্ত্র অশাস্ত্র ও অতিশয় অবহেলার সামগ্রী।

বর্ত্তমানকালে গণনায় জানা গিয়াছে, ব্রাহ্মণাদি মূলবর্ণ বলিয়া যাহারা পরিচিত, তাহাদের সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা মিশ্রবর্ণ-নামধারী জাতি-সকলের সংখ্যা বহুগুণ অধিক। ইহা কি সঙ্গত কথা, যে—প্রকাশ্য বিবাহের ফল অপেক্ষা গুপ্তবিবাহ ও অন্যায়-সংসর্গের ফল সহস্রগুণ অধিক হইল! এরূপ হইলে যাহাকে শাস্ত্রকারগণ গুপ্ত-বিবাহ বলেন, তাহাই যে প্রকাশ্য-বিবাহ হইয়া দাঁড়ায়! গুপ্ত-সংসর্গের তালিকা কি শাস্ত্রকারগণ খুঁজিয়া বেড়াইতেন? আর—ব্যভিচারিণী নারী কোন্ জাতীয় লোকের সংসর্গে অপত্যলাভ করিল, তাহা কি নিঃসংশয়-রূপে কেহ বলিতে পারে? শাস্ত্রকারগণ ত দূরে, তাহার স্বজনগণ এমন কি, অনেক সময় সে নিজেও স্থির করিয়া বলিতে পারে না।

আর একটী কথা—এই সকল শাস্ত্রপ্রমাণ একেবারে অসত্য। কারণ এই যে, ইহাদের মধ্যে পরস্পরের মিল নাই। কাহার কথা সত্য?

মনু-সংহিতার মতে, ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভজাত সন্তান নিষাদ বা পারশব। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ-মতে ঐরূপে উৎপন্ন সন্তান বারুজীবী। নিষাদ ও বারুজীবী যে একজাতি নয়, তাহা বোধ হয় সকলেই

জানেন! পশুপক্ষিঘাতী অনার্য্য বন্য নিষাদ জাতি এবং সদাচার বৈশ্য-বৃত্তি আর্য্য বারুজীবী বা বারুইজাতি কখনই এক নহে। এ সকল বচন একেবারে গোঁজামিল! মন্বাদিসংহিতায় ঐসকল অংশ পরবর্ত্তি-অজ্ঞগণের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত। নচেৎ যে মনু বলিতেছেন—"নাস্তি তু পঞ্চমঃ" অর্থাৎ চারিজাতি ব্যতীত পঞ্চম জাতি নাই, তিনিই আবার বহুবিধ জাতির উৎপত্তি লিখিতেছেন, ইহা কি সম্ভব?

ইহাপেক্ষা ঐমতে আরও একটী গুরুতর আপত্তিকর কথা আছে; একমাত্র যাহাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐমতের অসারতা প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। সে কথাটী এই যে, পুরাণাদিতে যে কেবল যৌনসংসর্গে জাতিবিশেষের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা নহে, হস্ত, পদ, মুখ, উরু প্রভৃতি স্থান হইতে অস্বাভাবিক মানবোৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গজ সন্তান নূতন জাতি হওয়া যদিও কিঞ্চিৎ সম্ভব হয়, কিন্তু, মৃত বা জীবিত ব্যক্তির হস্তপদাদি মন্থন করিলে, মানবের আবির্ভাব— সম্ভব হয় না। প্রজাপতি-ধর্ম্ম এরূপে অবৈজ্ঞানিক অযৌক্তিক প্রণালীতে তিরস্কৃত হওয়া বড়ই দুঃখজনক।

আরও আশ্চর্য্য কথা যে—এইরূপ উৎপন্ন জাতিবর্গের মধ্যে আর্য্য-সমাজের বহির্ভূত অনেক জাতি গৃহীত হইয়াছে। আর্য্য-সমাজের অন্তর্গত জাতি-সকলের একপ্রকার জন্ম লেখা হইল, পরে ভারতের বহির্দ্দেশ হইতে আগত অনার্য্য বা আর্য্যশাখীয় ব্যক্তিদের পিতা মাতা জুটাইতে অসুবিধা হওয়ায়, অপিচ ঐ সকল জাতির অদ্ভুৎ উৎপত্তি লিখিয়া, উহাদের ভারতীয় আর্য্য-সমাজের অঙ্গ-বিশেষরূপে প্রমাণ করিবার আবশ্যক হওয়ায়— তদ্রূপ অস্বভাবিক-জন্ম-জ্ঞাপক শাস্ত্র প্রণয়ন করা হয়। ক্রমে দৃষ্টান্ত যথা,— বেণ রাজার অঙ্গবিশেষ মন্থন করিলে, নিষাদ উৎপন্ন হইয়াছিল। অপর অঙ্গ বিশেষ হইতে একটী পুত্র এবং একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহা কি সম্ভব? সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ এবং বাহু হইতে ক্ষত্রিয় ও উরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্রজাতি জন্মগ্রহণ করে, এইরূপ মনু-সংহিতায় লেখা আছে, এটী কি যৌক্তিক? দ্রুপদ রাজার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন যজ্ঞাগ্নি হইতে এবং কন্যা দ্রৌপদী যজ্ঞবেদী হইতে উদ্ভূত

ছন, এরূপ লিখিত আছে। এ সকলের সত্য কোথায়? বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে "বেণস্যাঙ্গাৎ সমুদ্ভূতো ম্লেচ্ছো নাম সুতোহপরঃ। পুলিন্দঃ পুকশশ্চৈব খসো বৈ যবনস্তথা। সুহ্মকাম্বোজশবরাঃ খরশ্চেত্যাদয়ঃ সুতাঃ"। মৃতবেণের শরীর হইতে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, পুকশ, খশ যবন ইত্যাদি জাতি সমুদ্ভূত হইল! পুলিন্দ-পুকশ খস-শবরাদি জাতি যে অনার্য্য, তাহাতে সন্দেহ কি?

আর একটী কথা এই যে—সুবর্ণবণিক্‌-জাতি শাস্ত্রে পৃথক্‌ সঙ্কর-জাতি মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা বৈশ্যবর্ণ। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণে আছে "স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্‌ তস্যামম্বষ্ঠসম্ভবৌ" স্যাঁক্‌রা এবং সোনার-বেণে এই জাতিদ্বয় বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে। মতান্তরে স্বর্ণকার জাতির উৎপত্তি—"সরাক্যাং স্থপতেশ্চাপি স্বর্ণকারস্য সম্ভবঃ।" সরাকী রমণীর গর্ভে স্থপতিজাতীয় পিতার ঔরসে স্যাঁক্‌রার জন্ম! অদ্ভুত!! অন্যস্থানে সুবর্ণবণিকের স্বর্ণ-চৌর্য্যাপরাধে পাতিত্য লেখা আছে। অন্যদিকে "বল্লালচরিত"-নামক ঐতিহাসিক প্রমাণ্য গ্রন্থে দেখা যায়, রাজা বল্লাল টাকা ধার না পাইয়া, সুবর্ণবণিক্‌দিগের যজ্ঞোপবীত ছেদন করেন, এবং তাহাদের পাতিত্য প্রচার করেন।

গোপালভট্ট-বিরচিত বল্লালচরিতের আনন্দভট্ট-কৃত পরিশিষ্টে দেখা যায়—"যুদ্ধব্যয়নিমিত্তং যৎভূপতিঃ সেনবংশজঃ। বল্লভানন্দ আঢ্যাচ্চ জগ্রাহ বিপুলং ঋণম্‌। পুনঃ পুনঃ ঋণং যস্মাদ্‌ যযাচে মন্দধীরসৌ। তস্য প্রতারণাং জ্ঞাত্বা ন দদৌ স বণিক্‌ পুনঃ। ইদং হি কারণং যস্মাৎ বণিক্‌-জাতীঃ প্রতি প্রভুঃ। ক্রুদ্ধোভূত্বা স বল্লালশ্চকার জাতি-পাতনং।"

এই বণিক্‌গণ যে বৈশ্য—তাহার প্রমাণ শরণ-দত্ত-রচিত বল্লাল-চরিতে—"স্থানান্যুপকল্পিতানি সগনানাং পৃথক্‌ পৃথক্‌। ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়ানাং বণিজাঞ্চান্ত্যজন্মনাম্‌।" এখানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরে "বণিজাং" লেখা আছে, উহা অবশ্য বৈশ্যেরই স্থান। ঐ গ্রন্থে আরও দেখা যায়—বল্লালের বাটী নিমন্ত্রণ-দিনে "জ্ঞাতয়শ্চ কুটুম্বাশ্চ মিলিতাশ্চ ততোঽন্যদা। ভোজ্যশালাং প্রবিবিশুরাণকা রাজপুত্রকাঃ। আসনেষূপবিষ্টেষু ততস্তেষু মহাত্মসু, ভুঞ্জমানেষু সর্ব্বেষু বল্লালেন মুদাসহ। সৎশূদ্রানাঞ্চ-তত্র পরাঃ ভোজনশালিকাঃ; স্পর্দ্ধয়া বিবিশুর্ভোক্তুং বিংশাং ন দৃশ্যতে স্থলী।

তস্মিন্নবসরে বৈশ্যা মন্ত্রয়ন্তঃ পরস্পরম্। উত্তস্থুঃ নির্যাতুকামাস্তদানীং রাজসদ্মনঃ। যদা কেচিদ্বহির্যাতাঃ কেচিদ্বা গমনোদ্যতাঃ। তদা তানন্বগমাহ ভীমসেনো বিনীতবৎ। অনাহারাঃ কিমর্থং ভো! নির্গচ্ছথ মহাজনাঃ। অস্মাসু বো যদাকূতং সর্ব্বণার্হথ ভাষিতুং। তচ্ছ্রুত্বা বণিজঃ প্রাহুঃ শ্রূয়তাং ভো মহাশয়! স্পৃষ্টাস্পৃষ্টিঃ সমভবৎ তদর্থং ভোক্তুমক্ষমাঃ ইত্যাদি।" এখানে ক্ষত্রিয়দের ভোজনের পর, সৎশূদ্রেরা ভোজনশালায় প্রবেশ করায়, বৈশ্যদের স্থান না থাকায়, তাহারা পরামর্শ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। যখন ভীমসেন তাহাদিগকে গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তখন তাহারা বলিল—"ছোঁয়াছুয়ি" হইয়া গিয়াছে, আমরা খাইতে পারি না। এই স্থানে "বিশাং ন দৃশ্যতে স্থলী" অর্থাৎ বৈশ্যদের স্থান নাই—বলা হইল। পরে যাইবার সময়, ভীমসেনের কথার উত্তর দিতে "তচ্ছ্রুত্বা বণিজঃ প্রাহুঃ" বলা হইল। এখানে এই "বিশাং" এবং "বণিজঃ" একই ব্যক্তিদের লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বণিকেরা ঝগড়া করিয়া চলিয়া গেল। তদানীং রাজা বল্লালঃ ক্রোধঘূর্ণিতলোচনঃ। বণিজাং দর্পচূর্ণার্থং শপথং কৃতবান্ ভৃশং। অর্থাৎ ক্রুদ্ধ বল্লাল বণিক্‌দিগের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। "অদ্যাবধি ক্রিয়াহীনানাং বণিজাং যজ্ঞোপবীত-ধারণং ব্যর্থং, এতেষাং ক্রিয়াভাবাৎ শূদ্রত্বং জাতং, অতোদ্যপর্য্যন্তং এতে বণিজঃ শূদ্রাঃ, এতেষাং শূদ্রক্রিয়াদিকং ভবিষ্যতি। বিশেষতস্তু স্বর্ণবণিজঃ সর্ব্বে গোস্তেয়াঃ গোহত্যাকারিণশ্চ তদেতে অদ্যপর্য্যন্তং পতিতাঃ, শিষ্টৈরগ্রাহ্যাঃ, এতৈঃ নর যে ভোজনবিহরৈকাসনাক্রমণ-যজন-পংক্তিভোজনাদিকং করিষ্যন্তি, তেঽপি পতিতাঃ ভবিষ্যন্তি, অতস্তদ্-যাজকানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ অদ্য-প্রভৃতি পাতিত্যমিতি।" ইহার অর্থ—অদ্য প্রভৃতি ক্রিয়া-হীন সমস্ত বণিক্‌জাতির যজ্ঞোপবীত-ধারণ ব্যর্থ। ক্রিয়ার অভাবে ইহাদের শূদ্রত্ব হইয়াছে। অতএব অদ্যাবধি ইহারা শূদ্র, ইহারা শূদ্রক্রিয়া আচরণ করিবে। বিশেষতঃ সুবর্ণ-বণিক্‌গণ গোরুচুরি, এবং গোহত্যা করে, অতএব ইহারা অদ্যাবধি পতিত এবং শিষ্টগণের অগ্রাহ্য। ইহাদের সহিত ভোজন, বিহরণ, একাসনে উপবেশন এবং ইহাদের যাজন ইত্যাদি যাহারা করিবে, তাহারা 'পতিত' হইবে।

সুবর্ণ-বণিক্-যাজী ব্রাহ্মণেরা অদ্যাবধি পতিত। এই আদেশ কার্য্যে পরিণত না হইলে, বলপ্রকাশে তাহা করা হইয়াছিল; এবং বণিক্‌নামধারী সাধারণ বৈশ্যজাতির যজ্ঞোপবীত ছেদন করা হইয়াছিল। শরণ-দত্তের বল্লাল-চরিতে সমস্তই আছে, আর অধিক উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না।

এই সময়ে বৈশ্যসাধরণের নাম ছিল বণিক্। সুবর্ণ-বণিক, গন্ধ-বণিক্, তাম্বুল-বণিক্ ইত্যাদি বণিক্‌গণ তখনও পৃথক্ জাতি হন নাই, কেবল ব্যবসায়-ভেদের অনুসরণ করিতেন মাত্র। সুবর্ণ-বণিক্ ও তাহার পুরোহিতেরা 'পতিত' হইলেন। রাজা, আর সকল বণিকের যজ্ঞসূত্র ছেদন করিয়াই নিরস্ত হইলেন। এজন্য অস্মদ্দেশে গন্ধবণিক্, তাম্বুলবণিক্, প্রভৃতি বৈশ্যজাতির অধুনা যজ্ঞোপবীত নাই। বস্তুতঃ শাস্ত্রীয় "জাতির উৎপত্তি"—কোন বংশগত মান লাভ করিবার আশায় বংশগত-জাতিভেদ-ঘোষণাকারী স্বার্থপর ব্যক্তিগণের কুহকমাত্র। অনেক সময় বিশেষ কারণে ঐরূপ মিলাইতে হইয়াছিল। যেমন অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তিতে ব্রাহ্মণপিতা এবং বৈশ্যামাতা কল্পনা করা। ব্রাহ্মণের গুণ অধ্যয়নাদি এবং বৈশ্যগুণ ভেষজবিক্রয়াদি একত্র দেখিয়া, ঐরূপ অনুমানমূলক জন্ম লেখা হয়। যেরূপেই হউক্, ঐসকল জন্ম-বৃত্তান্ত একেবারে অসত্য।

জন্মানুসারে জাতি-বাদীর দ্বিতীয় যুক্তি,—বর্ণমূলক বিভিন্ন-রূপ জন্মের অনুমান—ইহাও কিছুই নয়। বর্ত্তমানে সমাজের নিম্নস্তরে যে সকল অনার্য্যজাতি প্রবেশ করিয়াছে, যথা ডোম, মেথর, বাগদী, সাঁওতাল বুনো ইত্যাদি—ঐগুলিকে বাদ দিলে, সকল হিন্দুসমাজেরই আকার প্রকার ও বর্ণ—প্রায় একরূপ। ঐ সকল জাতির মুখে এখনও অনার্য্য চিহ্ন আছে, উহারা কখনও এ সমাজের সঙ্কর-জাতি নয়। বর্ত্তমানে প্রায় সকল জাতির মধ্যেই বর্ণের সাম্য আছে। সুন্দর এবং কালো সকল সমাজেই আছে। এরূপ বর্ণনির্ণয় যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। ভারতবর্ষে যে এক সময়ে লালরঙের ক্ষত্রিয়জাতি ছিল, তাহারাই এখন বহুমিশ্রণে কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একথার প্রমাণ নাই। এদেশে লালমানুষ থাকিতে পারা অসম্ভব। পুরাণাদিতে ক্ষত্রিয় রাজাদিগের যে সৌন্দর্য্য বর্ণনার প্রাসঙ্গিক

ভাবে উল্লেখ আছে, তাহা রক্তবর্ণ নহে, হেমবর্ণ। কোথাও ভারতে রক্ত-বর্ণ মানবের অস্তিত্ব লেখা নাই। ক্ষত্রিয়ের রজোগুণ প্রধান, এইজন্য কেহ কেহ রজোগুণের কল্পিত রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয়ে আরোপ করিয়াছেন বোধহয়। অলঙ্কার শাস্ত্রে দেখা যায়, রৌদ্ররস রক্তবর্ণ, উহা অবশ্যই ঔপচারিক। রজোগুণকে রক্তবর্ণ বলা হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা রজোগুণ কি, জানেন, তাঁহারা এ সকল কথাকে বিজ্ঞান বা সত্যের সহিত না মিলাইয়া, অলঙ্কারের সহিত মিলাইবেন। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি বিভিন্নবংশীয় নহেন, একই জাতি ব্রাহ্মণাদি চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। "এক এব পুরাবেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ। দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এবচ।" প্রথমে এক ওঙ্কারই সমগ্র বেদস্বরূপ, এবং এক নারায়ণই সমগ্র দেবতা স্বরূপ, এবং একমাত্র অগ্নি ও একমাত্র বর্ণ বা জাতি ছিল। পরে ব্রাহ্মণাদি বিভাগ হয়। ইহাদের জন্ম বা জাতি পৃথক্ নহে। মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ সুন্দর নহে, তবে কি ইহারা অন্য জাতি? এ যুক্তি প্রকৃতপক্ষে যুক্তি-পদবাচ্য নহে।

প্রকৃতপক্ষে, চারিবর্ণের লোকসকল বিভিন্ন ব্যবসায় গ্রহণ করায় বিভিন্ন সম্প্রদায় হয়,পরে বিবাহাদি সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা আরম্ভ হয়। বহুকাল পরে, আর ইহারা এক-বংশীয় বলিয়া জ্ঞান থাকে না, এইরূপে স্বতন্ত্র বহু জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। আবার ব্যবহার—কর্ম্ম কতকটা ভিন্ন হইলে, শেষে কেহ ভিন্নরূপ আচারবান্ ব্যক্তিকে নিজজাতি বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। মোট কথা, সকলজাতিই এই চারিজাতির বিভিন্ন কার্য্যাবলম্বী শাখামাত্র, স্বতন্ত্র জাতি নহে। বঙ্গের বর্ত্তমান প্রচলিত জাতির মধ্যে, কতক গুলি জাতির প্রকৃতজাতিতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া, তাহাদের আচার ব্যব-হার সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়া, প্রাজ্ঞ পণ্ডিতেরা যেরূপ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ প্রকাশ করা গেল। ব্রাহ্মণ-সমাজে বিবাদ নাই। ব্রাহ্মণে অপর জাতি প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু অপর জাতিতে ব্রাহ্মণ কেহই নাহে। কায়স্থ ও উগ্রক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়। কৈবর্ত্ত (হালিক) গোপ, গন্ধবণিক্, তিলী, তাম্বুলী, বারুজীবী, বৈদ্য, সদেগাপ, সুবর্ণবণিক্, প্রভৃতি জাতি বৈশ্য, এবং কাঁসারী, কলু, মালাকর,

তন্তুবায়, রাজবংশী, যুগী, দাগগোয়ালা, ধোবা, শুঁড়ী, দুলে, বাগ্দী, বাউরী, বেদে, চাষাধোবা, চণ্ডাল, পোদ, বাইতি, বাজিকর, ব্যাধ, মুচী, জোলা, তেওর, হাঁড়ী প্রভৃতি জাতি শূদ্র। অনাবশ্যক বোধে অধিক লিখিত হইল না। এই উভয়বিধ মতের পূর্ব্বমতটী অধুনা অযৌক্তিক বিবেচিত হয়, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান-গ্রন্থে আমরা একটা জাতির আলোচনা করিব, তাহাতে উভয়মতেরই আবশ্যক, উপযোগ, সম্ভব ও যৌক্তিকতা বিচার করিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্গীয় বারুজীবীর বৈশ্যত্ব-স্থাপন ও শূদ্রত্ব-নিরাকরণ।

এ গ্রন্থে সমালোচ্য-জাতি বঙ্গীয় বারুজীবী, ইহারা বৈশ্য,—পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা যে উভয়বিধ মতবাদের আলোচনা করিয়াছি, সেই উভয়মত অনুশীলন করিয়াই আমরা প্রমাণ করিতে পারিব যে, বঙ্গীয় বারুজীবী জাতি শূদ্র নহে, উচ্চ আর্য্যত্রৈবর্ণিক বৈশ্য। সর্ব্বাগ্রে আমরা প্রথম মতটীর কথা না বলিয়া, দ্বিতীয় মতের দ্বারাই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টাকরিব,—ইহার প্রকৃষ্ট কারণ এই যে, প্রথম মতটী অধুনা ভ্রমপূর্ণ ও অযৌক্তিক বলিয়া অধিকাংশ পণ্ডিতের বিশ্বাস,—কিন্তু সেই কারণেই আমরা উহাকে পরিত্যাগ করিব না। কেবল উহার আলোচনা—শেষে করিব মাত্র। আমরা সন্দিগ্ধ-জাতি-নির্ণয়-নামক অধ্যায়ে, যে সকল উপায় নির্ব্বাচন করিয়াছি, সেই গুলি প্রয়োগ করিলে, এই জাতির শূদ্রত্ব সম্ভব নয়, পরন্তু উচ্চ ত্রৈবর্ণিকতা বা বৈশ্যত্ব সঙ্গত, এই তথ্য প্রমাণ করিতে পারি কি না, তাহাই প্রথম দেখিব। আমরা প্রথম উপায় আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইয়াছি, বঙ্গের সকল স্থানেই বারুজীবী জাতি প্রকৃষ্ট হিন্দু। আমরা বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের বারুই জাতির সত্যবাদিতা, শৌচাচারনিষ্ঠতা, দয়া, দান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং তদনুরাগিতা দর্শন করি। আর দেখি—ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্রাহ্মণাদির প্রতি অত্যধিক অনুরাগ ও ঐকান্তিক ভক্তি আছে। উহাদের সমাজের অত্যধিক উৎকর্ষ যে উহারা সদাচার।

শ্রাদ্ধাদি কার্য্য এবং অন্যান্য কামাকার্য্যে এই জাতির ভবনে ভারতের অধিকাংশ ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রিত ও সম্মানিত হন। বঙ্গের শাসন-বিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায়, চৌর্য্য, নরহত্যা, জালিয়াতী, ডাকাইতি, বলাৎকার প্রভৃতি জঘন্য অপরাধে কোনও বারুজীবিজাতীয় ব্যক্তি কারাগারের অতিথি হন নাই, ইহা কি সুন্দর নৈতিকতা ও সদাচারের নিদর্শন নহে? এ জাতি যে উচ্চজাতি এবং আর্য্যজাতি—ইহা কি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ নহে?

দ্বিতীয় উপায়ের আলোচনায় আমরা দেখি যে—ইহাদের মধ্যে বিবাহাদিকার্য্যে বৈদিকমন্ত্র পঠিত হয়। সুতরাং ইহাতে বুঝা উচিত যে এই জাতি আর্য্য, ও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য—ইহার কোনও একটা। এই জাতি শূদ্র নহে, বৈদিক মন্ত্রযুক্ত ত্রৈবর্ণিকোচিত সংস্কারাদির আবহমান কাল হইতে প্রচলনই তাহার সাক্ষী। বেদে "উষা" প্রধানা দেবতা। আর্য্যদিগের অভ্যুদয়ের দিনে, তাঁহারা উষাদেবীর পূজা করিতেন। এই পূজা অদ্যাপি বারুজীবীজাতির মধ্যে সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্ব-বঙ্গে উষা-পূজার যে আড়ম্বর দৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে রিজলী সাহেব লিখিয়াছেন "পূর্ব্ববঙ্গে আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষীয় নবমীতিথিতে বারুইগণ লক্ষ্যা-নদীর তীরে উষাপূজা করেন।" এই বৈদিকীপূজা অবশ্য আর্য্য ত্রৈবর্ণিকতার যথেষ্ট প্রমাণ। শূদ্র বা সঙ্করজাতির মধ্যে কখনও কুত্রাপি বৈদিক-দেবতার পূজা প্রচলিত নাই। বেদোক্তদেবতা উষা কুমারী। বারুইগণের পাণলতিকাও চিরকুমারী, ইহা কখনই পুষ্পফল প্রসব করে না, ইহা সত্য। আশ্বিন শুক্লপক্ষের নবমীতে যখন বঙ্গে গৃহে গৃহে কুমারী-দুর্গার পূজা হয়, তখন বারুইগণ পাণের বরজে পাণলতিকার—কুমারী উষার পূজা করেন। বারুইজাতির আর্য্যত্বের ইহা একটী অকাট্য প্রমাণ!

আর একটী অসাধারণ লক্ষণ দ্বারা আমি এই জাতিকে উৎকৃষ্ট বৈশ্যজাতি বলিতে পারিব, সেটী এই যে, বারুজীবী জাতির বিবাহাদি-ক্রিয়ার পদ্ধতি ব্রাহ্মণগণের বিবাহাদি পদ্ধতির অনুরূপ, বিশেষতঃ ইহাদের মধ্যে কুশণ্ডিকা প্রচলিত আছে। অনেক সময় দেখা যায়, যাহারা সমাজের ক্ষত্রিয়জাতি সেই কায়স্থজাতির মধ্যে অধিকাংশ স্থানেই কুশণ্ডিকানুষ্ঠান

দেখা যায় না, প্রায়শই লাজ-হোম মাত্র দেখা যায়। বৈশ্যজাতির মধ্যেও সর্ব্বত্র কুশণ্ডিকা নাই। বারুজীবীদের মধ্যে নিতান্ত মূর্খ ব্যতীত অপর সকলেরই বিবাহে কুশণ্ডিকা সম্পন্ন হয়। মাননীয় রিজলীসাহেবও এই জাতির 'কুশণ্ডিকা' সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শূদ্রত্বের সহিত কখনও কুশণ্ডিকার সাক্ষাৎ হয় নাই, ইহা আর্য্যত্বেরই পরিচয়। অন্যবিধ বৈবাহিক আর্য্যাচার সপ্তপদীগমন, ধ্রুব-অরুন্ধতী-দর্শনাদি ইহাদের মধ্যে আজিও বিরাজিত, ইহারা কি অনার্য্য শূদ্র?

তৃতীয় উপায়ের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারাও কোন কোন স্থলে এই জাতির প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি পুরাকাল হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছেন, বঙ্গের সকল স্থানের বারুজীবীদিগের ভবনে বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা ভোজন করেন, ইহা প্রত্যক্ষ। ঐ সকল ব্রাহ্মণ সমাজে হেয় নহেন। পণ্ডিতেরা নিমন্ত্রিত হইয়া "ফলাহার" করেন, ইহা সহস্রস্থানে প্রত্যক্ষ করা যায়। এমন কোনও স্থান বঙ্গে নাই, যেথানে বারুজীবী-জাতি ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ অনুগ্রহ ও সহানুভূতিলাভে বঞ্চিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতেছে, লোহাগড়া-নিবাসি রায়, মজুমদার, সরকার ইত্যাদি বারুজীবীগণের ভবনে কাশীপুরের সুপ্রসিদ্ধ কুলীন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা ও অন্যান্য খ্যাতনামা ব্রাহ্মণবর্গ সামাজিক ব্রাহ্মণরূপে গৃহীত ও আদৃত হইয়া আসিতেছেন। ইঁহারা আবহমানকাল হইতে অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং কেমনে বলিব এ জাতি শূদ্র? সকল স্থানেই বারুই জাতির এই উৎকর্ষের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। অধিক ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অনাবশ্যক।

চতুর্থ উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, দেখিতে পাই যে, এই জাতির চিরন্তনবৃত্তি পর্ণ প্রস্তুত করা। বারুজীবী, পর্ণকার, লতাবৈশ্য ইত্যাদি নামে এই জাতি পরিচিত। পাণলতার বাত-বর্ষা রৌদ্রাদি নিবারণকল্পে, ইহারা যে বর বা আবরণ প্রস্তুত করে, তাহাকে স্থানবিশেষে বারু, বর, বরজ, বুরজ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়। সেই আবরণপরিবৃত সুরক্ষিত পর্ণ-সকল—অন্যভাবে বলিতে গেলে

পাণের বরজ-সকল ইহাদের জীবিকা, এজন্য ইহাদিগকে বারুজীবী বা বারজী বলা হয়। পাণের প্রাচীনতা বিশ্ববিখ্যাত! খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী গোভিল-গৃহ্যসূত্র, সুপ্রসিদ্ধ সুশ্রুতসংহিতা, মৎস্যসূক্ত, মার্কণ্ডেয়-পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে পাণের প্রশংসা কীর্ত্তিত আছে। ঐ পাণপ্রস্তুত অবশ্য বৈশ্য-সমাজেরই সামগ্রী, কৃষি বাণিজ্যই বৈশ্যবৃত্তি, পর্ণকৃষক অবশ্য বৈশ্য, যেহেতু পুরাকালে বৈশ্যব্যতীত অন্যে কৃষির অধিকারী ছিল না। পর্ণরচনা যে বারুজীবিজাতির প্রাচীনবৃত্তি, তাহা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। পাণের প্রস্তুত-প্রণালী অতীব বিশুদ্ধ। অন্যান্য কৃষিকার্য্যে ভূমিকর্ষণ আবশ্যক হওয়ায়, অজ্ঞাতসারে জীবহত্যার অনুমোদন করিতে হয়, স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে কৃষির উৎকর্ষবিচারপ্রসঙ্গে প্রাণিহিংসাদি পাপাশঙ্কা কথিত হইয়াছে। পাণের সম্বন্ধে এ বিপদের উল্লেখ বা সম্ভাবনাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, পাণ প্রস্তুত করিতে ভূমিকর্ষণ করিতে হয় না। অধুনা অশঙ্কিত-চিত্তে বলা যাইতে পারে, পর্ণরচনায় ধর্ম্মানুমত পবিত্রতা রক্ষিত হয়। প্রবাদ আছে, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরাও এই পাণপ্রণয়ন কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। পুরাকালে ব্রাহ্মণেতর জাতি পাণলতা স্পর্শ করিবার অনুমতি পাইত না, অদ্যাপি নীচজাতির বরজে প্রবেশ দূষণীয় মনে করা হয়। কোনও ব্যক্তি অশুচিদেহে অথবা অপবিত্রবস্ত্রে এখনও বরজে প্রবেশ করে না। রজস্বলা স্ত্রীলোকেরা কখনও বরজ স্পর্শ করিতে পান না। এ সকল সদাচার এখনও রক্ষিত এবং আদৃত আছে। বরজের পবিত্রতা যথেষ্ট। আর্য্যগণের দ্বারা বরজনির্ম্মাণ এক সুন্দর সত্য মনে করাইতে পারে। 'বর' কথাটী প্রাচীন পারশীক জেন্দ্ অবেস্তা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, উহার সেখানেও অর্থ আবরণ। অহুরমেজ্দা উপাসকদিগকে ঝটিকাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্য 'বর' প্রস্তুত করেন, অবেস্তায় এরূপ নির্দ্দেশ আছে। 'বর' দেখিতে ক্ষুদ্রদুর্গের ন্যায়। এই 'বর' রচনা করা—মৌলিক আর্য্য-ভাবের লক্ষণ। আসাম, রাজপুতনা, হিমালয় ইত্যাদি অঞ্চলে, অনেক অসভ্যজাতির নিবাস আছে, কিন্তু কোনও স্থানের অনার্য্যজাতিদিগের মধ্যে 'বর'-প্রস্তুত-প্রথা নাই। ইহা একটী সুন্দর আর্য্যভাবজ্ঞাপক বস্তু। বরজের মধ্যস্থান অত্যধিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সেখানে গমন করিলে তৃপ্তি হয়।

ডাক্তার ওয়াইজ্ একজন প্রসিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন, তিনি ঢাকাপ্রদেশে যে বরজনির্ম্মাণপ্রণালী দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ সে বর্ণনা সুন্দর। বরজ উত্তরদক্ষিণে লম্বমান হয়, প্রবেশ-দ্বার পূর্ব্বপশ্চিমে রক্ষিত হওয়া নিয়ম, আবরণ সাধারণতঃ ৬ হাত দীর্ঘ হয়। ভিজোল সুপারি ইত্যাদি গাছ—ইহার খুটার স্বরূপ ব্যবহৃত হয়, নল, পাটখড়ি এবং তালপত্র দ্বারা বেড়া নির্ম্মিত হয়। উপরে নল ও খড় প্রভৃতি দিয়া গৃহের ন্যায় ছাউনি করা হয়। মধ্যস্থান উচ্চ ও চারিদিক্ ঢালু করা হয়, ভূমি শুষ্ক হওয়া আবশ্যক, জল বসিলে পাণ-বিনাশের সম্ভাবনা। যে স্থানে বরজ রচনা করিতে হয়, তথাকার দুইহাত মাটী উঠাইয়া ফেলিতে হয়। পরে পাকমাটী ও খৈল্ দিতে হয়। প্রত্যেক গাছের গোঁড়ায় একরূপ কাটী সংলগ্ন করা দরকার, যাহার সাহায্যে পাণলতা উর্দ্ধে আরোহণ করিতে পারে। এক বৎসরে লতাকে তিনবার কাটীর গোঁড়ায় জড়াইয়া দিতে হয়। শীতে পাণ সযত্নে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক, পাণ তীব্র, কাজেই কীটাদির, প্রবেশ ও তজ্জন্য অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। বরজ সুন্দর পরিষ্কার। যত্নে রাখিলে, এক একটী দ্বাদশবর্ষস্থায়ী হয়, একরূপ দেখা গিয়াছে। এই বরজ নির্ম্মাণের মৌলিকতা আর্য্যজাতির—বৈশ্যজাতির সন্দেহ নাই।

পাণের পবিত্রতা ও আবশ্যকীয়তা এদেশে যথেষ্ট। আমরা গোভিল-গৃহসূত্রে দেখিতে পাই "মুঞ্জকাশতাম্বল্যো রসনাঃ" উপনয়নকালে যে রশনা বা কটীবন্ধনী ব্যবহৃত হয় (যাহাকে মেখলা বলা হইয়া থাকে,) তাহা মুঞ্জ, কাশ এবং তাম্বলীলতা দ্বারা করিতে হইবে। উপনয়নসময়ে ব্রহ্মচারীর কটীবন্ধনী-রচনা যে পবিত্রতম বস্তুর দ্বারা করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে অধিক লেখা অনাবশ্যক। ইহাকে পবিত্রতার সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ মনে করা যাইতে পারে। তাম্বুল পুরাকাল হইতে রাজসম্মানের নিদর্শন স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। নৈষধচরিতপ্রণেতা মহাকবি শ্রীহর্ষদেব নিজসম্মানের উল্লেখ-প্রসঙ্গে নৈষধের শেষে লিখিয়াছেন "তাম্বুলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্য-কুব্জেশ্বরাৎ" কান্যকুব্জাধিপতির প্রদত্ত তাম্বুল প্রাপ্ত হওয়া—অবশ্য রাজ-সম্মানের চিহ্ন। বর্ত্তমানসময়েও লাট্দরবারে পাণ দিয়া যোগ্যপাত্রের সম্মান করা হয়। রামায়ণাদিতে "পাণসুপারি" দ্বারা নবনিযুক্ত সেনাপতির

সম্মান প্রদর্শনের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণসমাজে,এখনও বঙ্গের বহুস্থলে,বিবাহাদি-প্রসঙ্গে নবকুটুম্বদিগকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিতে হইলে, পাণসুপারি দ্বারা সম্মান করিতে হয়। যদি তাঁহারা পাণসুপারি গ্রহণ করেন, তবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা বুঝিতে হয়। সুতরাং ইহাকে আত্মীয়তার বা সহভোজনের নিদর্শন বলা যাইতে পারে।

মহারাষ্ট্রদেশের "পাণসুপারি-সভা" সর্ব্বজনবিদিত। মান্দ্রাজপ্রদেশে বহুকালব্যাপী বিবাদবিসম্বাদের নিষ্পত্তি হইলে, পরস্পর পরস্পরকে পাণ দিয়া সেই নিষ্পত্তির পরিচয় দেওয়া হয়! সিংহলের অনেকস্থলে, পাণের নামে শপথ করার প্রথা আছে, ইহা অবশ্য প্রশস্ততার জ্ঞাপক। উত্তর-পশ্চিম বা পঞ্জাবে সামাজিক সভা বা বহুজনসমাগমে, যদি কোনও সম্মানিতব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া, অপরকে অগ্রে পাণ দেওয়া হয়, তবে ঐ সম্মানিত ব্যক্তি অপমানিত হইলেন বলিয়া মনে করেন। উত্তরপশ্চিমে সৌহার্দ্দ প্রগাঢ়ভাব ধারণ করিবার পূর্ব্বে, কাহাকেও নিজেদের প্রস্তুত পাণ দেওয়া হয় না। বাজারের ক্রীত তৈয়ারি পাণ দেওয়া হয়। শেষে সুহৃদ্ বলিয়া স্থির হইলে, 'পাণ' অর্থাৎ নিজেদের বাটীর তৈয়ারি পাণ দিয়া বন্ধুত্বের পরিচয় দেওয়া হয়।

পাণ হিন্দুর গৃহে বিবাহ-অন্নারম্ভাদি প্রত্যেক মাঙ্গলিক-কার্য্য ও পূজাদি-কার্য্যে এবং যে কোনও প্রকারের স্বজন-সমাগমে অত্যন্ত আবশ্যক। পাণ ছাড়িয়া দিলে,দেবতাপূজার উপচারই কম পড়িয়া যায়। হিন্দুর দেবভোগ্য সামগ্রীর পবিত্রতার বিষয়ে অপর বক্তব্য কি ?

পাণের রস অনেক ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্লেষ্মাদিনাশকতায় পাণ নিজেই অপূর্ব্ব ঔষধ।

সুপ্রসিদ্ধ সুশ্রুতসংহিতায় সূত্র-স্থানে ৪৬ অধ্যায়ে পাণের গুণ উল্লিখিত আছে—যথা,—তাম্বুলপত্রং তীক্ষ্ণোষ্ণং কফপিত্তপ্রকোপনং। সুগন্ধি বিষদং তিক্তং স্বর্য্যং বাতকফাপহং। শ্রমণং কটুকং পাকে কষায়ং বহ্নিদীপনম্। বক্ত্রকণ্ডুমলক্লেদদৌর্গন্ধ্যাদিবিনাশনং। ইহার অর্থ এই যে, তাম্বুলপত্র তীক্ষ্ণোষ্ণ কটু, পিত্ত-প্রকোপকর, সুগন্ধি, বিষদ, তিক্ত, স্বরদোষনাশক, বাতশ্লেষ্মার শান্তিজনক, শিথিলকর, কটুপাক, কষায়, অগ্নিদীপক, বক্ত্রকণ্ডু মলের ক্লেদ ও মুখেরদুর্গন্ধ বিনাশ করে।

পাণের রস ২।১ ফোঁটা চক্ষে দিলে, ২।৩ দিনের মধ্যে 'রাত্‌কাণা' রোগ সারিয়া যায়। সর্দ্দিকাস প্রভৃতি শ্লেষ্মাঘটিত রোগে, পাণে তৈল মাথাইয়া উত্তপ্ত করিয়া বক্ষে লাগাইয়া দিলে, আরোগ্য হওয়া যায়, ইহা পরীক্ষিত, শিশুদিগের পক্ষে অত্যন্ত খাঁটে। যকৃতে রক্তাধিক্য-রোগেও এই প্রক্রিয়া ফল-প্রদান করে। স্তন্যক্ষরণে পাণ গরম করিয়া, স্তনে বাঁধিয়া রাখিয়া দিলে, উপকার দর্শে। ক্ষতস্থানে পাণ লাগাইয়া রাখিলে, ক্রমে ক্রমে ক্ষতশান্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জলে ভিজান-পাণ শঙ্খদেশে লাগাইলে, শিরোবেদনা বিনাশ সংঘটিত হয়। পাণের বোঁটা ও চুণের সাহায্যে ক্ষণকাল মধ্যে আঁচুলী (অর্ব্বুদ) উঠাইয়া দেওয়া যায়। শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে পাণের বোঁটার ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রদ। পাণের আরও অশেষ গুণ আছে। যাহার এত গুণ এত প্রয়োগ, এত পবিত্রতা, এত দেবপ্রিয়তা, তাহার উৎপাদক জাতি কি অনার্য্য ?

অনেকে বারুজীবী-জাতিকে শুধু পর্ণকৃষক মাত্র বলিতে চাহেন, আর তাম্বুলীকে উহার বিক্রেতা বলেন, তাঁহাদের মত ভ্রান্ত। তাঁহারা জানেন না যে, বঙ্গে সহস্র ২ বারুজীবী পর্ণ বিক্রয় করে এবং অন্য কোনও জাতি করে না। পরিব্রাজক ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী তাঁহার "সিদ্ধান্ত-সমুদ্র" গ্রন্থের তৃতীয়খণ্ডে বারুজীবীজাতির ইতিবিবরণ লিপীবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন "এজাতি তাম্বুলবিক্রেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে।" একথার সহিত সত্যের সংশ্রব নাই। তিনি এই প্রসঙ্গে কয়টী কথা বলিয়াছেন, তাহার ভাব এই—ব্রাহ্মণের গোপালন নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু বিক্রয় নিষিদ্ধ, কোনও কোনও জাতির দ্রব্য-উৎপাদন বৈধ, কিন্তু বিক্রয় বৈধ নহে। আমরা জানি না যে, পর্ণকৃষকেরা কে পর্ণ বিক্রয় না করে ? আর পর্ণবিক্রয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে, গোবিক্রয়াদি নিষিদ্ধ ও পাতিত্য-জনক। কৃষি এবং বাণিজ্য এই দুইটী বৈশ্যধর্ম্মই বারুজীবীদের পর্ণের আশ্রয়ে সাধিত হয়। তাম্বুলীরা পাণ-বিক্রেতা নহে, পাণের খিলী-বিক্রেতা।

"বঙ্গীয় তাম্বুলী "বৈশ্য" নামক গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "পাণ প্রথমে "পর্ণ" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। তাহাতে মস্‌লা সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিবার নিয়মপ্রচলিত হইলে, 'তাম্বুল' নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রকৃত-পক্ষে

মস্‌লা সংযুক্ত খিলীই তাম্বুল, যাহারা পাণের খিলির ব্যবসায় করে, তাহারা তাম্বুলী।" মহাভারতী-মহাশয় তাম্বুলীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, অবশ্য বুঝিতে পারিতেন। আর একটী কথা—পাণ-শব্দকে উক্ত মহাভারতী 'পাণীয়' শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়াছেন। কিন্তু পাণ-শব্দ সংস্কৃত 'পর্ণ' শব্দের অপভ্রংশ,—যেমন 'কর্ণ' শব্দের অপভ্রংশ 'কাণ' তদ্রূপ। পর্ণশব্দে যে ঐ সামগ্রীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা একটু চেষ্টা করিয়া পাঠ করিলে বুঝা যায়। পর্ণকার পর্ণজীবী ইত্যাদি শব্দ, বারুজীবীর পরিবর্ত্তে শাস্ত্রকারগণ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ঐ জাতির উৎপত্তি যাহা লিখিত আছে, তাহা অসঙ্গত, কিন্তু ঐ নামগুলি যৌগিক শব্দ, তাহার সন্দেহ নাই। সংস্কৃত অভিধানমাত্রেই পর্ণশব্দ আছে, তাহার অর্থও পাণ। তাম্বুল অর্থ তৈয়ারি-পাণ, কিন্তু সাধারণতঃ—শুধু 'পাণ' নামক পাতাকে লক্ষ্য করিয়াও 'তাম্বুল' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। প্রস্তুত-পাণ এবং অপ্রস্তুত-পাণ, ভাষায় বিশেষ পৃথক্‌ভাবে কথিত হয় না। তৈয়ারী পাণকে সাধারণতঃ আমরা 'পাণ'ই বলি, কিন্তু উহাই কি সত্য? পর্ণ-শব্দ সেই একজাতীয় পাতাকে বিশেষভাবে বুঝায়। এই ব্যবহার-ব্যতিক্রম দোষাবহ নহে। স্মৃতিশাস্ত্রে আছে "পত্রাণাং পর্ণমামিষং" পত্রসকলের পর্ণ অর্থাৎ পাণ আমিষ। ইহা উত্তেজক বলিয়া বিধবা, ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে ব্যবহার করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহারা আমিষশ্রেণীভুক্ত। পর্ণ শব্দের অর্থ পাতা, সাধারণ-বাচক শব্দ বিশেষ-বাচক হয়, এই নিয়মে উহা বিশেষভাবে পাণ-পাতাকে বুঝায়। ব্যাসসংহিতায় আছে, "পর্ণং দত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ" এখানে অবশ্য সাধারণ পাতা নহে, পাণই।

এখনও অনেকস্থানে গাছে পাণ জন্মে, বরজ-প্রথা নাই। মৎস্যসূক্তের ষড়্‌বিংশতিপটলে—'সকল গাছের পাণ গ্রাহ্য নহে', লেখা আছে। ঐ গ্রন্থ আসামে লিখিত, এইরূপ সকল পণ্ডিতের মত, তথায় ঐ প্রথাও আছে। আমরা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, পাণের 'পর্ণ' নাম দেখাইব। "অথবাস্তগুবাকঞ্চ কৃত্বা পর্ণ-সমন্বিতং। শঙ্খশম্বুকচূর্ণেন বিলিপ্তেন নিবেদয়েৎ। কর্পূরবাসিতং দেবি! মৃগদর্পসমন্বিতং, ধন্যাকমধুরীকাদ্যৈঃ সাধিতস্তু নিবেদয়েৎ। এলাচম্পকমুক্তাদ্যৈঃ মুখবাসঃ প্রশস্যতে। কপর্দ্দকস্য বৃক্ষস্য পলাশস্য চ শঙ্করি! তচ্চূর্ণং বর্জ্জয়েৎ দেবি! বৃক্ষপর্ণং ন দাপয়েৎ। কালিবৃক্ষস্থিতং পর্ণং পনসস্থং ন দাপয়েৎ।

অশোকশাম্মলীষ্বং বা সদৈব পরিবর্জ্জয়েৎ। আম্রনিম্বগতঞ্চাপি শস্তং পর্ণং মম প্রিয়ে।" এই স্থানের পর্ণ-শব্দ 'পাণ' অর্থে প্রযুক্ত। মার্কণ্ডেয়পুরাণেও পর্ণ-শব্দের প্রয়োগ আছে। বিস্তার-শঙ্কায় উদ্ধৃত হইল না। এই পর্ণ বা পাণই পবিত্রতম, ইহার উৎপাদনপ্রণালী নির্দ্দোষ। ইহার বাণিজ্যও দোষ-শূন্য। এই বৃত্তি যাহাদের চিরন্তন আশ্রয়, সেই জাতি নিশ্চয় বৈশ্য।

উৎকৃষ্ট পাণের নাম "কর্পূরীয়" সাধারণতঃ ইহাকে কর্পূরকাত্ কহে, ইহাতে কর্পূরের গন্ধ আছে। বিক্রমপুরের সুবর্ণগ্রামে ও মেদিনীপুরের মণ্ডলঘাটে এই পাণ জন্মে। ইহার নীচে শাঁচি পাণ, ইহা কলিকাতাদি সহরে আদৃত। লক্ষ্ণৌয়ের নবাববাহাদুরের যত্নে একপ্রকারের সুগন্ধ (আনারস-গন্ধ-যুক্ত) পাণ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার নাম আনারসী পাণ। দেশী, বাঙ্গালা, জারিরস, ঘাসজল, কটকী, পশ্চিমে, হিঙ্গলঘাটা, মহোবাই, রাণীময়ী, ভর্ত্তনাই, গাজীপুরী, জৌনপুরী, কমলাবুণে, মিঠাপাণ, পূর্ব্বিয়াপাণ, বর্দ্ধমেনে পাণ ইত্যাদি নানা জাতীয় পাণ আছে। পাণ-গ্রহণ-সম্বন্ধে জলগ্রহণের ন্যায় বাঁধাবাঁধি নিয়ম পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে, তবে কতকটা শিথিল হইয়াছে। যাহাদের জল ব্যবহার করা যায় না, তাহাদের বাড়ীতে কেহ পানও খায় না। যাহারা শুদ্ধ জলাচরণীয় আর্য্যজাতি, তাহাদেরই পাণ সকলে খায়। বারুজীবী জাতির ইহাও উৎকর্ষের পরিচয়। ইহাদের পবিত্র ও বৈশ্যজনোচিত জীবিকা ইহাদের জাতিনির্ণয়ে উপাদেয় প্রমাণ, মনে হয়। এতক্ষণে আমরা বুঝিলাম, বারুজীবী জাতি পবিত্রপর্ণব্যবসায়ী, সুতরাং আর্য্য বৈশ্য, অনার্য্য শূদ্র নহে।

ইহাদিগের প্রচলিত 'বারুই' নাম, বারুজীবী বা বরজী শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। এ জাতির ব্যক্তিরা বহুদিন পূর্ব্বকার কাগজপত্রে 'জাতি বারুজীবী' লিখিতেন। 'বারুই' কথাটী তাহারই পরিণতি, ইহা সংস্কৃত বা মৌলিক শব্দ নহে। আর্যসমাজে যখন ব্যবসায় পুরুষানুক্রমিক হয় নাই, তখন উহা সাধারণতঃ বৈশ্যবৃত্তি ছিল, তখন বারুজীবী প্রভৃতি বা 'বারুই' শব্দ উৎপন্ন হয় নাই। পরে ব্যবসায়ানুগত জাতিভেদ ব্যবস্থিত হইবার সময়, উহারা বিরাট বৈশ্যসমাজের মধ্যে ক্ষুদ্র একটী জাতি হইল, এবং ব্যবসায়ানুগত উপাধি গ্রহণ করিল। এখন আমরা অবশ্য বুঝিব, প্রাচীন কাল হইতে

পাণ প্রচলিত আছে, কেহ অবশ্য উহা উৎপাদন করিত। যতদূর দেখা যায়, তাহাতে কৃষিকার্য্য দ্বারা পাণ উৎপাদন এবং পত্রাদির বিক্রয়—বৈশ্যজাতিরই কার্য্য ছিল। এখন দেখিতে পাইতেছি, বারুইজাতি পাণের বরজ প্রস্তুত করে, কোনও অনার্য্যজাতি বরজ করে না। এরূপাবস্থায় বলা কি অসঙ্গত, যে, ইহারাই প্রাচীনকালে 'বৈশ্য' সমাজের এক অংশ ছিল? তজ্জন্যই মন্বাদিসংহিতা গ্রন্থে 'বারুই' জাতির নাম পাই না, কারণ তখনও বিশেষ উপাধি সৃষ্টি হয় নাই, কেবল 'কৃষক' বা 'বণিক্' নামই যথেষ্ট। এখন বলা যায়, ইহাদের প্রাচীনবৃত্তি আর্য্যত্ব-বৈশ্যত্বের বা উৎকর্ষের প্রমাণ।

পঞ্চম উপায় সাহায্যে অবগত হওয়া যায়, এই জাতির ব্যক্তি-সকলের অবয়ব আর্য্য-জনোচিত। ইহাদের মুখাবয়বে এমন এক শান্তভাব বিরাজিত, যে তাহা অনার্য্যত্ব-আরোপের অত্যধিক প্রতিদ্বন্দী। ইহাদের মধ্যে ডোম, বাগ্দী প্রভৃতি অনার্য্যজাতির ন্যায় নাসিকা, ও বদনমণ্ডল কাহা-রও নাই। উচ্চতর ব্রাহ্মণাদি সমাজের ব্যক্তিগণের আকার-অবয়বাদির সহিত ইহাদের অবয়ব সম্পূর্ণ একরূপ। ইহাদের মধ্যে কখনও ২ কৃষ্ণবর্ণ লোক দেখা যায়, কিন্তু তাহার মুখশ্রী আর্য্যোচিত। বলা বাহুল্য, ইহাদের ন্যায়, উচ্চতর ব্রাহ্মণাদিজাতির মধ্যেও কৃষ্ণকায় লোক দেখা যায়, তাহা উক্ত জাতিদিগের অপকর্ষের প্রমাণ নহে। ইহাদের কথোপকথনের ভাষা, বঙ্গের শিক্ষিত উচ্চতর-জাতির কথোপকথনের ভাষা। ইহাদের মধ্যে কোনও অনার্য্যশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। এই জাতির মধ্যে কিয়ৎ-পরিমাণে সংস্কৃতের চর্চ্চা আছে। ঢাকা অঞ্চলেই তাহা অধিক। সে প্রদেশে ৭০ জন শিক্ষিত সংস্কৃতাভিজ্ঞ কবিরাজ এই জাতির প্রাচীন আর্য্য ভাষানুশীলনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যশোহর, জেলায় মতিরঞ্জন দাস নামক একব্যক্তি গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'কাব্যতীর্থ' উপাধি পাইয়াছে। এদিকেও এই জাতির মধ্যে কিঞ্চিৎ সংস্কৃতচর্চ্চা দেখা যায়। প্রাচীন আর্য্য-ভাষায় অনুরাগ, এবং বর্ত্তমান উচ্চতর ব্রাহ্মণাদির সহিত সমভাবাভাবিত্ব অবশ্য উৎকর্ষের অন্যতম প্রমাণ।

ষষ্ঠ উপায়ের পরীক্ষায় দেখা যায়, এই জাতির মধ্যে বিধবার বিবাহ কুত্রাপি হয় না। বিধবারা ব্রাহ্মণাদির বিধবার ন্যায় একাদশী ও অন্যান্য ব্রত

করেন। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা, সাধুশীলা, ধর্ম্মানুরাগিণী। ইহাকে আমরা উৎকর্ষ বলিতে পারি, কারণ নীচজাতিতে এ পবিত্রতা নাই, দেখা যায়।

সপ্তম উপায়ের অনুশীলনে জানা যায়, এই জাতির পুরোহিতগণ 'পতিত' নহেন। তাঁহারা অপরাপর ব্রাহ্মণগণের সহিত সমভাবেই সমাজে গৃহীত হন। নীচজাতির পুরোহিতের ন্যায় স্বতন্ত্রশ্রেণীতে পরিগণিত হন না। যাঁহারা বারুজীবীজাতির পৌরোহিত্য করেন, তাঁহারা যে কেবল এই এক-জাতির পৌরোহিত্য করেন, তাহা নহে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য ইত্যাদি সমাজের উচ্চজাতির বাড়ীতেও পৌরোহিত্য করেন। ইহাতে ব্রাহ্মণাদিরা তাঁহাদের "শূদ্রযাজী" বলিয়া পরিত্যাগ করেন না। সর্ব্বত্রই বারুজীবীদের পুরোহিতেরা কায়স্থাদির পুরোহিত। ব্রাহ্মণসম্বন্ধে কোনও ২ স্থানে একটু ব্যতিক্রম আছে, তাহা বারুজীবীদিগের পুরোহিতের ন্যায় কায়স্থ-বৈশ্যের পুরোহিতের প্রতিও সমান প্রযোজ্য। অনেকস্থানে অনেক ব্রাহ্মণ-বাটীতে—বৈশ্য, কায়স্থ, বা বারুজীবী কাহারও পুরোহিত পৌরোহিত্য করিতে পান না; তাহা কেবল ব্যক্তিগত বা অবস্থাগত স্বতন্ত্রতা ব্যতীত ব্রাহ্মণ-সমাজের সামগ্রী নহে। বঙ্গে ব্রাহ্মণসমাজের শতকরা ৮০ বাটীতে কায়স্থ, বৈশ্য ও বারুজীবীদের পুরোহিত পৌরোহিত্য করেন। মোটের উপর বলা যায়, সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণদিগের পুরোহিতেরা বারুজীবীর পৌরোহিত্য না করিলেও সর্ব্বত্রই কায়স্থের ও বৈশ্যের পুরোহিতেরা বারুজীবীর পৌরোহিত্য করেন। অতএব বৈশ্য বা কায়স্থের অপেক্ষা বারুজীবীর স্থান নিম্নে নহে। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি, রায় শ্রীযদুনাথ মজুমদার বাহাদুরের পুরোহিত শ্রীমহিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের, (সুপ্রসিদ্ধ বৈশ্যপল্লী কালিয়াতে বহু বৈশ্য যজমান আছেন। রায়-বাহাদুরের ভগ্নীপতির পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈশ্যের পৌরোহিত্য করেন। প্রত্যুত সকল স্থানেই এরূপ আছে। ইহা শূদ্রত্বের বিরোধী, অপিচ বৈশ্যত্বের প্রমাণ। এই জাতির বাটীতে যে সকল ধোবা-নাপিত কার্য্য করে, তাহারাই ব্রাহ্মণাদির বাটীতে কার্য্য করে, এনিয়মের কুত্রাপি ব্যভিচার নাই। বঙ্গের যতগ্রামে এজাতি আছে, সেই সকল স্থানে যে ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, তাঁহাদের সকলেই ইহাদের ধোবা-নাপিতের দ্বারা সেবিত হন;

কেহই ইহাদের সেবাকারী ধোবানাপিত ত্যাগ করেন না। ইহাও একটী আর্য্যত্বের প্রমাণ।

অষ্টম উপায়ের আলোচনায় অবগত হওয়া যায়, প্রাচীনকালে পাণের প্রচলন ছিল কিন্তু পাণপ্রণেতা জাতির নাম পাওয়া যায় না। শাস্ত্রে পাণের উৎপত্তি হেতু কৃষিকার্য্যকে বৈশ্যবৃত্তি বলা হইয়াছে, এবং পাণের বাণিজ্য বা পত্র-বিক্রয় বৈশ্যের ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, পাণ-রচনা দ্বারা স্বতন্ত্র জাতি গঠনের পূর্ব্বে, এই জাতি এবং অন্যান্য বণিক্ জাতি একই "বৈশ্য" নামে পরিচিত ছিল। পরে কার্য্য বা ব্যবসায়ের ভেদে, ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া, কালে ভিন্ন জাতি হয়। বৈশ্যের বাণিজ্য একবিশাল সামগ্রী, ইহার অবলম্বন-দ্রব্যভেদে গন্ধবণিক্, সুবর্ণ-বণিক্, তৈলী, তাম্বুলী, বারুজীবী, মোদক প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের ভিন্নজাতি হইতে হয়। পণ্যভেদে বণিকের জাতিভেদ হয়।

এই সমস্ত জাতির নাম প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না, কারণ তখন এসব জাতি জন্মে নাই, ইহারা 'বৈশ্য' নামেই পরিচিত হইত। দুই একখানি পরবর্ত্তী-গ্রন্থে ইহাদের নাম পাওয়া যায়। তাহাতে ঐ সকল অংশ অত্যন্ত উপেক্ষণীয় অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত বিবেচনায় হেয় বলিয়া মনে হয়। বারুজীবীজাতি সম্বন্ধে দেখা যায়—যজু-র্ব্বেদে অনেক ব্যবসায়ীর উল্লেখ আছে, এজাতি বা ব্যবসায়ের উল্লেখ নাই। অপর বেদত্রয়ে ও কল্পসূত্র-প্রভৃতিতেও এজাতির নাম নাই; কারণ, তখন ও এনাম বা এইরূপ ব্যবসায়মূলক স্বতন্ত্র-জাতির সৃষ্টি হয় নাই। পরে সংহিতাগ্রন্থে ও নাম পাওয়া যায় না। বশিষ্ঠধর্ম্মসূত্র, বৈধায়নধর্ম্মসূত্র, মনুসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা, অত্রিসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, গোতমসংহিতা, বশিষ্ঠসংহিতা, ও রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থে এজাতির উল্লেখ নাই। ইহাতে এজাতির তত্তৎকালে স্বব্যবসায়োচিত 'বৈশ্যত্ব'ই অনুমিত হয়। এ জাতি যদি সঙ্কর বা অন্ত্যজ হইত, তবে তাহার উল্লেখ থাকাও আবশ্যক ছিল। বস্তুতঃ তাহা নাই। এস্থলে মনে রাখা উচিত, ঐ সকল শাস্ত্রীয় বর্ণসঙ্কর-উৎ-পত্তি অসার কল্পনামাত্র। ইহা প্রাচীনকালে 'বৈশ্য' নামে অভিহিত হইবার প্রমাণ।

প্রাচীনকাল হইতে এই জাতির মধ্যে 'বিশ্‌' উপাধি প্রচলিত আছে। বিশ্‌ উপাধি যে বৈশ্যত্বজ্ঞাপক, তাহার সন্দেহ নাই। 'বিশ্‌' অর্থই বৈশ্য। উহা অন্য কোনও জাতির নামের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না। 'বৈশ্য' বাচক শব্দের দ্বারা, বৈশ্যজাতিকেই অভিহিত করা যাইতে পারে। অতএব বুঝা যায়, প্রাচীনকালেও ইহাদের 'বৈশ্য'ই মনে করা হইত।

আর একটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, প্রাচীন কালেও ইহারা উৎকৃষ্টবর্ণমধ্যে গণ্য ছিল। বর্ত্তমানে নীচজাতিদের মধ্যে বহু-গোত্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। হয় কাশ্যপ, নয় আলম্যান ইত্যাদি দুই একটী গোত্রেই শেষ হইতে দেখা যায়। বারুজীবী জাতির গোত্র, আলম্যান, মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, কশ্যপ, বাৎস্য, বিষ্ণুমহর্ষি, জয়ন্তমহর্ষি, জনকর্ষি, কণ্বমহর্ষি, চিত্রমহর্ষি, পরাশর, জামদগ্ন্য, ঘৃতকৌশিক, কাত্যায়ন, খড়্গমহর্ষি, ঔলুক্যমহর্ষি, উল্লাস, মনীষি, আত্মর্ষি, হংসর্ষি, সৌদাস, মধু-ঋষি, উত্তর-ঋষি, বশিষ্ঠমহর্ষি, গৌতম, দণ্ডমহর্ষি, বিল্লমহর্ষি, শ্রীমহর্ষি, গোবর্দ্ধনমহর্ষি, চন্দ্রমহর্ষি, গোবিন্দমহর্ষি, ব্যাস, ব্রহ্মা, কৃষ্ণ, সনক, অনন্ত, জৈমিনি, পুণ্যমহর্ষি, সুমহর্ষি, পদ্মমহর্ষি, বিন্দুমহর্ষি, সাবর্ণ, বৈয়াঘ্রাপত্য, কৌশিক সৌকালিন প্রভৃতি। সকলেই জানেন, ব্রাহ্মণেতর জাতির গোত্র—পুরোহিতের অতিদিষ্ট গোত্র। যদিও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় একই বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, তথাপি ব্রাহ্মণাদি-বর্ণত্রয় বিভাগের পরে, গোত্রপ্রথার উৎপত্তি হওয়ায়, তখন আর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের বংশধর নহেন; অবশ্য ঐ গোত্রপ্রবর্ত্তক-গণের পূর্ব্বপুরুষের বংশধর বটেন। এইজন্য গোত্রপ্রবর্ত্তকগণের বংশধর না হওয়ায়, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের বংশধর হইয়াও, ইহারা তাঁহাদের 'গোত্র' বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন নাই;—কাজেই অতিদিষ্ট পুরোহিতগোত্রের প্রচলন আরম্ভ হয়। গোত্রপ্রবর্ত্তক অমুকঋষি বা তাঁহার বংশধরগণ যাঁহাদের পুরোহিত, তাঁহারা (ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য) সেই গোত্র হইলেন। এইহেতু অতিদিষ্ট-গোত্রের কথা শাস্ত্রে দেখা যায়। কদাচিৎ যে ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদির সগোত্র বিবাহ দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, উভয়পক্ষের গোত্র এক হই-লেও বংশ বিভিন্ন। কারণ, ব্রাহ্মণের গোত্র এক হওয়া—বংশগত একতার পরি-চায়ক হইলেও, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের পক্ষে উহা উভয়ের পুরোহিতবংশের একতামাত্র

প্রতিপাদন করে, সুতরাং সগোত্র-বিবাহ সেস্থানে দোষাবহ হয় না। যাহা হউক্, এই গোত্রাবলী হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, এই জাতির পৌরোহিত্য প্রাচীনকালে ব্যাস, বশিষ্ঠ, জৈমিনি প্রভৃতি নামধারী ঋষি বা ব্রাহ্মণগণ করিতেন; ইহা অবশ্য উৎকর্ষের পরিচয়। কায়স্থেরও গোত্রসংখ্যা এত অধিক নহে। নীচজাতির গোত্রসংখ্যা অল্প। কারণ দুইএকজন ব্রাহ্মণ তাহাদিগের পৌরোহিত্য করিতেন, সকলে স্বীকার করিতেন না। সমগ্র ভারতের ব্রাহ্মণসমাজ খুঁজিলে, এই সকল গোত্র পাওয়া যাইবে। ইহা জাতীয় উৎকর্ষের এবং প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণজাতির সহিত অত্যধিক সংস্রবের পরিচায়ক। এখন বুঝিলাম, প্রাচীনকালে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে যাজন করিতেন।

কেহ মনে করিবেন না যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থের মৌদগল্য কাশ্যপ হইতে এই বারুজীবীর গোত্রস্বরূপ মৌদগল্য কাশ্যপ অন্য,—প্রবর দ্বারা এক বলিয়া চিনিতে পারা যায়। কেহ এগুলিকে কল্পিত ও মনে করিবেন না। আবহমান কাল হইতে, এই সকল গোত্রপ্রবর অবলম্বনে, তাহাদের সমস্ত সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এই আধুনিক জাতীয় আন্দোলনের দিনে, এগুলি ইহাদের সমাজে প্রক্ষেপ করা হইতেছে এমন নহে। সত্য চিরদিনই সপ্রকাশ।

অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, কোনও বারুজীবী কখনও দাসত্ব (খানসামাগিরি) করে নাই। ইহা হইতে বুঝাযাইবে যে, ঐ জাতি প্রাচীন বা আধুনিক সমাজে শূদ্রোচিত দাসত্ব বা সুশ্রূষাকার্য্য করে নাই বলিয়া, এবং বৈশ্যোচিত কৃষিবাণিজ্য করে বলিয়া—উহারা বৈশ্য। যদি এই জাতি শূদ্র হইত, তবে কখনই এজাতিতে দাসত্বের অত্যন্ত অভাব হইত না। জাতীয় বৃত্তি নষ্ট হইতে পারে, জাতীয় আচার অন্যরূপ হইতে পারে, কিন্তু সমগ্রজাতি খুঁজিলে কোথাও না কোথাও উহা পাওয়া যাইবেই যাইবে।

বৈদ্যজাতি চিকিৎসাব্যবসায়ী, অনেকে ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্তকার্য্য করিতেছেন;—কিন্তু উহাদের মধ্য হইতে এ ব্যবসায় উঠিয়া যায় নাই, যাইবেও না। ব্রাহ্মণেরা পুরাকালে অগ্নিহোত্রী ছিলেন, সে প্রথা তাঁহাদের জাতীয়প্রথা—নিজস্ব ছিল,—অধুনা প্রায় নাই, তথাপি বৈতরণী, বেরার, হাইদ্রাবাদ, যাজপুর প্রভৃতি স্থানে, এবং বঙ্গে প্রদেশের স্থানে স্থানে পল্লীতে

ঐ প্রথা জীবিত আছে; অত্যন্ত উচ্ছেদ হয় নাই, হইবেও না। ইহা দ্বারা বলা যাইতে পারে, প্রাচীনকাল হইতে এ জাতির জীবিকা বৈশ্যজাত্যুচিত কৃষি-বাণিজ্য, শূদ্রোচিত দাসত্ব নহে।

অন্য একটী দ্রষ্টব্য এই যে—কায়স্থ ও বৈশ্যের সমস্ত উপাধি বারুজীবীজাতির মধ্যে দৃষ্ট হয়। দত্ত, দাস, নন্দী, ভদ্র, মজুমদার, সরকার, রায়, কুণ্ডু, পাল, ভাওয়াল, ঘোষ, কর, নাগ, শর, মিত্র, সেন, বিশ্বাস, দেব, সমদ্দার, লাহা, শীল, রক্ষিত, রাহা, সিংহ, লস্কর, শিক্দার, দো, হরি, মাঝি, বন্দ্য, ঢালী, ধর, প্রামাণিক, মহালদার, ইন্দ্র, আইন্, আউল্, সোম, শূর, কর্ণ, ভক্ত, বেজ, আশ, ভট্ট, রাহুত, হোড়, গুহ, দাঁ, নিয়োগী, নায়ক, চন্দ্র, মণ্ডল, রুদ্র, ভৌমক, বোস, বীর, দাম, বিশ, খাঁ, অধিকারী, চৌধুরী, হালদার, মল্লিক, মান্না, মারিক, লাহা, নন্দন, পালিত, বিষ্ণু, ব্রহ্ম, আদিত্য, পাইক, গুপ্ত, ইত্যাদি ইহাদের উপাধি।

শুধু যে উপাধি মিল, তাহা নহে, স্থানে স্থানে গোত্রে বংশে মিল আছে। কায়স্থ-মজুমদার মৌদ্গল্য-গোত্র, বারুই-মজুমদার মৌদ্গল্য-গোত্র, উভয়েরই কৌলিক উপাধি 'দত্ত'। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যশোহর চ কুরিয়ার মজুমদার প্রসিদ্ধ—শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয়নাথ মজুমদার বিএল্ মুন্সেফ্ প্রভৃতি তদ্বংশীয়গণের প্রাচীনপদবী 'দত্ত', তাঁহারা মৌদ্গল্য-গোত্র। যশোহর লোহাগড়ার রায় শ্রীযদুনাথ মজুমদার বাহাদুর প্রভৃতি মজুমদার-উপাধিধারীগণেরও প্রাচীন উপাধি 'দত্ত', উঁহারাও মৌদ্গল্য-গোত্র। এত সাদৃশ্যের কারণ যাহাই হউক, ইহা বারুইজাতির উৎকর্ষের প্রমাণ বটে।

এই জাতির উপাধিসকলের মধ্যে—'দত্ত' উপাধিও বৈশ্যত্ব-জ্ঞাপক। প্রাচীনকালে বৈশ্যদিগেরই 'দত্ত' উপাধি ছিল। কুল্লুকভট্টধৃত যমবচনে জানাযায়, বৈশ্যরা ভূতি বা দত্ত উপাধি ব্যবহার করিতেন। "শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য, বর্ম্মা ত্রাতাচ ভূভুজঃ। ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ" দত্ত উপাধি পূর্ব্বে বৈশ্যের ছিল, অধুনা অনেকেরই আছে। যাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন, তাহাদেরও আছে। তাঁহাদের সহিত 'বৈশ্য' মিশিয়া গিয়াছে কিনা, চিন্তার বিষয়! যাহাহউক, বৈশ্যোচিত 'দত্ত' উপাধি

দ্বারা অবগত হওয়া যায়, প্রাচীনকালের এবং বর্ত্তমানের বারুইগণ তাহাদের বর্ণোচিত 'দত্ত' উপাধি লাভ করিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কায়স্থেরা (এখনও অধিকলোকে) দাস-ঘোষ, দাসসিংহ ইত্যাদি নাম বলিতেন। 'দাস' না থাকিলে 'কায়স্থ' হয় না,—একথা এখনও প্রাচীন কায়স্থের মুখে শুনা যায়। ব্রাহ্মণের 'দাসত্ব' স্বীকার করিয়া কায়স্থেরা কুলীন হন। কায়স্থের মধ্যে দত্তেরা দাসত্ব স্বীকার না করায় কুলীন হইতে পারেন নাই। প্রমাণ ঘটককারিকা—"দত্ত কারো ভৃত্য নয় শুন মহাশয়! সঙ্গে এসেছি শুধু এই পরিচয়।" বারুজীবীজাতি নামের সঙ্গে দাস বলে না, বা লেখেনা। তাহাদের মধ্যে, দাস উপাধি আছে, কিন্তু কায়স্থের মত নাম বলিবার সময় 'দাসদাস' না বলিয়া শুধু 'দাস' বলে, ইঁহাতে বুঝাযায়, এজাতি 'দাসত্ব' অঙ্গীকার না করায় ইহাদের মধ্যে কৌলীন্য হয় নাই। কায়স্থের মধ্যে যাহারা 'দাসত্ব' স্বীকার করিলেন, তাহারা কুলীন হইলেন। অপর অকুলীন কায়স্থেরা শেষে কুলীন কায়স্থদিগের প্রাধান্যে 'দাস' বলিতে আরম্ভ করে। কারণ, তৎকালে কুলীনেরা 'কায়স্থ' না বলিলে, তাহারা কায়স্থ থাকে না, এই ভয়ে শেষে 'দাস' হইতে হইল, কিন্তু কৌলীন্যের ত আর পুনরাবৃত্তি হয় না! এ আন্দোলনে বুঝিলাম, বারুজীবীজাতি বৈশ্যতেজঃ রক্ষা করিয়াছে, দাসত্ব-স্বীকারের বিনিময়ে কৌলীন্য চাহে নাই। ক্ষাত্রয়-বংশজ কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়তেজ ভুলিয়া কৌলিন্যের সামান্য মানের লোভে 'দাসত্ব' স্বীকার করিয়া বল্লালের ফাঁদে পা দেন। বালীর দত্ত স্বতেজঃ রক্ষা করেন, কৌলীন্য চরণে দলিত করেন। এক্ষণে বলা যায়, ঐ কায়স্থ-সাম্য ও কৌলীন্য না থাকা, ইহাদের (বারুইজাতির) প্রাচীন্ বৈশ্যত্বের প্রমাণ সন্দেহ নাই। ইহারা শূদ্র হইলে, দাস শব্দ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

এই জাতি যে অনার্য্য শূদ্র নহে, আর্য্য বৈশ্য, তাহার আর একটী প্রমাণ ইহাই যে—প্রাচীন কাল হইতে এই জাতির সমাজ দরিদ্র ছিল না। কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা 'বৈশ্য' জাতিরাই যে স্বীয় সমাজকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল, অপর অনার্য্য সেবাব্যবসায়ী শূদ্রগণ যে কেবল কষ্টে জীবিকার্জ্জন করিত,—তাহা বোধহয় স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। শূদ্রের

কোনও দিন ধন ছিল না। বঙ্গদেশের প্রকৃত শূদ্র হাঁড়ি, ডোম, দুলে প্রভৃতি জাতিদের ধন ছিলও না, নাইও। শূদ্রের বৃত্তি সেবা বা দাসত্ব, তাহার বিনিময়ে জীবন-যাত্রানির্ব্বাহই যথেষ্ট, সম্পত্তিশালী হওয়া দুষ্কর। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাই, "শক্তেনাপিহি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ। শূদ্রোহি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে।" শূদ্র সমর্থ হইলেও তাহার ধনোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ সে ধন প্রাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মণের পীড়া উপস্থিত হয়। আরও দেখুন "ভার্য্যাপুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয়এবাধনাঃ স্মৃতাঃ। যত্তে সমধিগচ্ছন্তি, যস্যৈতে তস্য তদ্ধনং।" ভার্য্যা, পুত্র ও দাস ইহাদের ধনাধিকার নাই, ইহারা যে ধন প্রাপ্ত হয়, তাহা ইহাদের প্রভুর, অর্থাৎ ইহারা যাহার তাহারই হইবে। আরও দেখা যায় "বিশ্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ দ্রব্যাদানং সমাচরেৎ। ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্যধনোহি সঃ, ব্রাহ্মণ বিশ্রব্ধ ভাবে শূদ্র হইতে ধন গ্রহণ করিতে পারে, যেহেতু শূদ্রের কিছুই ধন নাই, তাহার ধন প্রভুগ্রাহ্য। প্রাচীনকালের এই ব্যবস্থা দেখিয়া কি কেহ কেহ বলিতে চাহেন, প্রাচীনকালের ধনসম্পত্তি এবং ভূসম্পত্তিশালী বারুজীবী জাতি বৈশ্য নহে শূদ্র? প্রাচীনকাল হইতে জমিদার তালুকদার প্রভৃতি শ্রেণীর লোক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যেই ছিল, এখনও আছে। এই জাতির মধ্যে ভূমিশূন্য ব্যক্তি কেহ নাই। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি পাইয়া, এবং কায়স্থাদিবর্ণেরা চাকরীলব্ধ অর্থের দ্বারা অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালেও যথেষ্ট ভূসম্পত্তি করিয়াছেন। কিন্তু এই বৈশ্য বারুজীবী জাতির যাহা ভূমিসম্পত্তি, তাহা প্রাচীনতমকালের—বলা যাইতে পারে, ইহাও বৈশ্যত্বের যথোচিত প্রমাণ।

এই জাতির নামানুসারে বারুইপুর, বারুইখালি, বারুইবাটি, বারুইপাড়া ইত্যাদি বহু গ্রামের নাম হইয়াছে। ইহা প্রাচীন-কালের প্রসিদ্ধি ও ভূমিবল ধনবলের পরিচায়ক। ২৪ পরগণার বারুইপুরে প্রাচীনকালে বারুই রাজা থাকার প্রবাদ আছে। এখনও ঐ স্থানে বারুজীবীজাতীয় শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ দত্ত জমিদার বাস করেন; এবং বহু সম্পন্ন শিক্ষিত বারুজীবী তথায় আছেন।

প্রাচীনকবি ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে এবংময়ূরভট্টের কাব্যে বারুই-

রাজার রাজ্যশাসনাদি বর্ণিত আছে। অবশ্য ইহা সম্পাদকতার ও পুস্তক-লিখেখের প্রমাণ হইতে পারে। প্রাচীনকালে দত্ত-বংশীয় বুদ্ধিমন্ত খাঁচৌধুরী সুন্দরবন অঞ্চলের প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। টাকীর শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায়চৌধুরী বিএ, মহাশয়ের 'বঙ্গীয় সমাজ' নামক গ্রন্থে এই রাজার উল্লেখ আছে।

সাতক্ষীরা জমিদারী কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লক্ষণচন্দ্র রায় মহাশয় ঐ অঞ্চলের অধিবাসী, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার মুখে এই বারুই রাজার কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম। অন্যান্য অনেকলোকের মুখেও ঐ কথা বারম্বার শুনিয়া, অনুসন্ধানার্থে লোক পাঠাইয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই,—"যেখানে রাজা বুদ্ধিমন্তের রাজধানী ছিল, সে স্থান বর্ত্তমান সময়ে ডোমরাইল্ আবাদ নামে খ্যাত। ইহা সুন্দরবনের উত্তর অঞ্চলের অংশ বিশেষ। উক্ত আবাদের কিয়দংশ অধুনা খুলনা, এবং কিয়-দংশ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্ভূত হইয়াছে। বহুস্থান জঙ্গলে আচ্ছন্ন। ভগ্নাবশেষ, উদ্যানবাটিকা, এবং নবরত্ন সমাযুক্ত বিষ্ণুমন্দির এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত হিজলগঞ্জ নামক স্থানে যমুনা-নদীতীরে, রাজা বুদ্ধিমন্তের সেনানিবাসের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। বিষ্ণু-মন্দিরের পশ্চিমে যমুনার অপরপারে আর একটী স্থানের নাম খোসবাগ। জনপ্রবাদ এই যে, উহাই রাজার উদ্যানবাটিকা ছিল। বিষ্ণুমন্দিরের উচ্চতা প্রায় একশতহস্ত, দৈর্ঘ ৩০ হস্ত ও প্রস্থ ২৯ হস্ত। দক্ষিণহস্তের দিকে গরুড়, কৃষ্ণ, বলরাম, এবং বামহস্তের দিকে নারায়ণ ঋষির মূর্ত্তি স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মন্দিরে এখন বিগ্রহ নাই। টাকীনিবাসী জমিদার ৺গোবিন্দরাম রায় চৌধুরী মহাশয় এই মন্দিরের মূর্ত্তি স্বগৃহে লইয়া গিয়া সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরে প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে একটী সংস্কৃত শ্লোক খোদিত আছে। ভালরূপ পাঠ করা যায় না। বিশেষতঃ প্রেরিত লোক সংস্কৃত জানে না। কাজেই যতটুকু পারিয়াছে, লিখিয়া আনিয়াছে। সেই অস্পষ্ট শ্লোকের সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত কিয়দংশ এই—

"শাকেরে দশমাযুক্তি বসুবাণে * * বিতে।
মঠোহয়ং সোপান * শ্রীকৃষ্ণেন কৃতো ময়া।"

এই শ্লোকপাঠে অসন্দিগ্ধ কালনির্ণয় না হইলেও, বহুপূর্ব্বকালের মনে করা যাইতে পারে। এরূপ অনেকে বলেন যে, রাজা বুদ্ধিমন্ত প্রতাপাদিত্যের ও পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।

রাজা বুদ্ধিমন্তের বংশাবলীর সন্ধান যাহা পাওয়া যায়, তাহা এই—রাজা বুদ্ধিমন্তের পুত্র যশোবন্ত, তৎপুত্র কমলাকান্ত। তৎপরবর্ত্তী কয়েক পুরুষের নাম অজ্ঞাত; ইঁহারা ডোমরাইল শীতলপুর গ্রামে বাস করেন। তৎপরে রামকান্ত দত্তচৌধুরী, ইঁহার পুত্র রামলোচন, ইঁহার পুত্র রামতনু, তৎপুত্র রামময়, তৎসুত রাধানাথ, রাধানাথের সন্তান রামধন, রামধনের সন্তান সৃষ্টিধর এবং সৃষ্টিধরের পুত্র প্রতাপচন্দ্র দত্তচৌধুরী। রামময় দত্তচৌধুরীর সহোদর রামজীবন দত্তচৌধুরী, ইনি শ্রীপুরবাসী। ইঁহারপুত্র মধুসূদন, তৎপুত্র মদনমোহন, মদনমোহনের পৌত্রী মধুমতী। এই পর্য্যন্ত সংবাদ পাওয়া যায়। খুলনার জেলা অন্তর্গত পাইকগাছা থানার অধীন আমাদী গ্রামে বুদ্ধিমন্ত খাঁর বংশ আছে, শুনা যায়। এত পুরুষ অতীত হইতে কতসময়ের দরকার ইহা—চিন্তা করিলেই, রাজা বুদ্ধিমন্তের প্রাচীনতা বুঝা যায়। বুদ্ধিমন্ত খাঁ স্বাধীন ধর্ম্মানুরক্ত সেনাবলযুক্ত প্রকৃত রাজা ছিলেন। অতএব কেমন করিয়া বলিব যে—ভূমিশূন্য ধনবিহীন শূদ্রজাতির সহিত এই প্রাচীন ধর্ম্মানুরাগী সম্পন্নজাতির কিছুমাত্র সংস্রব আছে? সর্ব্বথা ইহারা বৈশ্য, সন্দেহ নাই। এখনও অনেক সম্পন্নব্যক্তি এই সমাজ শোভিত করিতেছেন।

নবম উপায়ের আলোচনায় জানিতে পারি যে,—দেশের প্রাচীন ও আধুনিক সময়ের গণ্যমান্য সমাজতত্ত্ববিৎগণ ইহাদিগকে বৈশ্যগণ মধ্যে স্বীকার করেন, এবং শূদ্র হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বহুবর্ষ পূর্ব্বে, প্রাচীন পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার 'জাতিমালা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন "শূদ্রও কায়স্থ গোপ, বারুই নাপিত। তার মধ্যে ভেদাভেদ কহিব নিশ্চিত।" এখানে 'শূদ্রও' এই-'ও' শব্দের দ্বারা কায়স্থ, গোপ, বারুই প্রভৃতিকে শূদ্র হইতে পৃথক্ বলা হইয়াছে। "শূদ্রও বারুই ইহাদের ভেদ কহিব"—এরূপ কথা কেহ বলিলে, অবশ্য তাহার দ্বারা বুঝাযায়, তিনি এই শূদ্র ও বারুইকে এক বলেন নাই। কারণ, বিযোজক অব্যয় 'ও'

শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। "রাম ও শ্যাম" বলিলে, রাম শ্যামের পার্থক্যই প্রতিপাদন করা হয়। একজন প্রাচীন পণ্ডিত শূদ্র ও বারুইকে পৃথক্ জাতি বলিলেন, ইহা দেখা গেল।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বারুইজাতি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে, উত্তর হইল "ঋষি কহে কৃষি আছে বৈশ্যদের বৃত্তি। তাম্বুলে তাদিন্ পায় বারুয়ের জাতি।" ভারতবিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীমণ্ডিত বিদ্যাগার সদাচার "চতুঃষষ্টি কলায় পরিপূর্ণ" ব্রাহ্মণ-সমাজপতি নরপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সভায়, যাহারা বৈশ্য নামে অভিহিত হইল, তাহারা কি শূদ্র? ১২৭৯ সালে সংগৃহিত ও প্রকাশিত "রসরাজ গোপাল ভাঁড়ের সমস্যা" গ্রন্থে এই কবিতা এবং ইহার আনুপূর্ব্বিক গল্প আছে।

বহু প্রাচীন ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে দেখা যায়, ধর্ম্মরাজের দ্বাদশজন ভক্তের মধ্যে 'শিবদত্ত' নামক বারুইজাতীয় একজন ছিলেন "মহাভক্ত সেবক ছিল বারুই শিবদত্ত। ধর্ম্মপূজা করিল সে অতিসুমহত্ত্ব।" এই বারুই শিবদত্ত যখন ধর্ম্ম-সেবক ছিলেন, তখন তাঁহার জাতিকে গ্রন্থকর্ত্তা "শূদ্র" মনে করেন নাই। প্রাচীন কবি রমাই পণ্ডিত লিখিয়াছেন—

"প্রথমে বন্দনা করি বিপ্র পদতল। তারপর সম্ভাষণ ক্ষত্রিয়ের দল। তারপর আশীর্ব্বাদ শ্রীকুমার দাস। যার স্বর্ণদীপে জ্বলে আলো বারমাস। ধর্ম্মের পূজয়ে যেঁহ ঐকান্তিক ভক্ত। ধর্ম্মের সন্ন্যাসে যেঁহ বুকের কাটি রক্ত। বারুইকুলে জন্ম তার পূর্ব্বজন্মে যোগী। বৈশ্যধর্ম্ম পালনেতে অতি সুখভোগী।"

এখানে প্রথমে ব্রাহ্মণ (প্রণাম), পরে ক্ষত্রিয়ের (সম্ভাষণ), তৎপরে বৈশ্যের উল্লেখই আবশ্যক হয়। কবি বৈশ্যস্থানেই শ্রীকুমার দাসের উল্লেখ করিয়াছেন। পরিশেষে তাঁহাকে শেষশ্লোকে বারুইকুলে জাত ও বৈশ্য-ধর্ম্ম-পালনকারী বলিয়া স্পষ্টরূপে বৈশ্যই বলিয়াছেন। প্রধান ব্রাহ্মণকবি রমাই পণ্ডিত যাহাদের 'বৈশ্য' বলিয়াগিয়াছেন, তাহারা কি শূদ্র?

হুগলী জেলার জাহানাবাদ থানার অন্তর্গত সারাটি গ্রামের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ 'যাত্রাসিদ্ধি ধর্ম্মরাজ' মন্দিরের পণ্ডিত মহাশয়, তাঁহার পুস্তকে লিখিয়া-গিয়াছেন,—"ধর্ম্মের সেবক দল শ্রীধর্ম্মের পাছে। দ্বাদশসেবক প্রধান শ্রীধর্ম্মের

আছে। সকল জাতির মাঝে রহিছে ধার্ম্মিক। বারুইদলের মাঝে আছয়ে অধিক।

* * * *

আনে পাণ আনে গুয়া আর কতশত। ধর্ম্মের সেবনে বারুই কত বিধিমত।
অপুত্রের পুত্র হয়, নির্দ্ধনের ধন। ধর্ম্মের কৃপায় হের বাড়ে বারুইগণ।
বারুই ভক্তের জাতি বৈশ্যবৃত্তি করে। খাইতে শুইতে তেঁহ শ্রীধর্ম্মেরে স্মরে।"

এখানেও বারুই জাতিকে ধর্ম্মানুরাগী 'বৈশ্য' বলা হইল। ইহা কি শূদ্রত্ব-পরিহারের প্রমাণ নহে?

বর্ত্তমান কালের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সন্ন্যাসী বহুভাষাভিজ্ঞ পরিব্রাজক ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় তাঁহার 'সিদ্ধান্তসমুদ্র' গ্রন্থের তৃতীয়খণ্ডে বারুজীবী জাতিকে বৈশ্য বলিয়াছেন। তিনি ২০টী প্রমাণের দ্বারা বৈশ্যত্ব নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সে প্রমাণ সকল এই গ্রন্থেও নানাস্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক দেখি না। এক্ষণে বোধহয় বলা যাইতে পারে, প্রাচীনকাল হইতে শাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিত, বিজ্ঞ কাব্যরচয়িতা বা সমাজতত্ত্বজ্ঞ ঐতিহাসিকদিগের অভিমত এই বারুজীবীজাতি 'বৈশ্য'। এসম্বন্ধে আর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের অবয়ব বৃদ্ধি করিব না।

দশম উপায়ের চিন্তায় বলা যাইতে পারে, ধর্ম্মশাস্ত্রে কৃষিবাণিজ্য বৈশ্যের বৃত্তি বলিয়া উল্লিখিত আছে। এ জাতির সাধারণ অবলম্বন কৃষি ও বাণিজ্য। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশমত কর্ম্মানুসারী জাতিনির্ব্বাচনের যুক্তি—ইহাদিগকে বৈশ্য জাতি বলিতে চাহে, বুঝিলাম। ইহাদের প্রাচীন ও আধুনিক পবিত্রতা, ধর্ম্মানুরাগ, দেবদ্বিজ-শাস্ত্রভক্তি আর্য্যাবয়ব, সদাচার, নিষ্ঠুরতা—কুকার্য্য রাহিত্য অর্থাৎ চৌর্য্য-নরহত্যাদিশূন্যতা, উদারতা, প্রাচীন-কাল হইতে বৈশ্যবৃত্তি সম্পত্তিশালিতা ইত্যাদি গুণসকল নিরপেক্ষভাবে অনুশীলন করিলে, কোনও মনস্বীব্যক্তি এজাতিকে ঘৃণিত অনার্য্য শূদ্র বলিবেন না, প্রত্যুত আর্য্য বৈশ্য বলিবেন।

এ বিষয়ে দশটী পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত উপায়ের সাহায্যে আমরা বুঝিলাম, বঙ্গীয় বারুইজাতি শূদ্র নহে, বৈশ্য। এতক্ষণ আমরা সমাজের সমস্তজাতি চতুর্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত, এই জাতিতত্ত্ব বিধিবিষয়ক প্রথম সিদ্ধান্ত লইয়া,

বারুজীবীজাতি বৈশ্য বা শূদ্র, এইতথ্য নির্বাচনে অগ্রসর হইয়া, যে উপায়ে এ সত্য নিশ্চিত হইতে পারে, সেই দশটী উপায়ের পর্য্যালোচনায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহা এই যে—বঙ্গের বারুজীবীগণ বৈশ্য, শূদ্র নহেন।

এখন আমরা চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত সঙ্করজাতির অস্তিত্ব আছে,—এই জাতিতত্ত্ব বিষয়ক দুর্ব্বল দ্বিতীয়মতের সাহায্যেও এজাতির বৈশ্যত্ব প্রমাণে প্রয়াস পাইব। প্রথম ঋক্‌সংহিতা, যজুঃসংহিতা, সামসংহিতা এবং অথর্ব্ব-সংহিতা এই চারিখানি বেদ-সংহিতা অন্বেষণ করিয়া, বারুজীবী জাতির নাম পাওয়া গেল না। পরে শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রেও নাম পাওয়া যায় না। বশিষ্ঠ-ধর্ম্মসূত্র, বোধায়ন-ধর্ম্মসূত্র, গোতম-ধর্ম্মসূত্র, আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্র ইত্যাদিতেও এ জাতির নাম মিলিল না। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির বিংশতি স্মৃতিসংহিতায় ও এজাতির নাম নাই। ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণু-পুরাণ, শিবপুরাণ, শ্রীভাগবত, মার্কেণ্ডেয়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ ইত্যাদি পুরাণেও ইহাদের উল্লেখ নাই। প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ মহাভারতেও উল্লেখ নাই। ভারতীয় কাব্যরাজ্যের সম্রাট্ অত্যধিক প্রাচীন রামায়ণেও ইহাদের নাম নাই।

আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখিতে পাইতেছি—"ব্রাহ্মণ পিতা ও তাম্বুলীমাতার সন্তান বারুজীবী বা পর্ণকার।" এই শ্লোকের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, ইহাদিগকে বর্ণসঙ্কর বলা যায়। কিন্তু এ শ্লোকে কেন, এ পুরাণখানি ও আধুনিক। এখনও অনেক পণ্ডিত এই গ্রন্থকে মূলরহিত ও আধুনিক মনে করিয়া, ব্যঙ্গোক্তিসূচক "ব্রহ্মকৈবর্ত্ত" নামে অভিহিত করেন। প্রমাণিত হইয়াছে,—এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় দ্বাদশশতাব্দীর অনেকপরে রচিত। এই সময় নূতন বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি অসম্ভব। কারণ কলির প্রথমেই বর্ণ-সঙ্কর-নিদান অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে। যদি বলা যায়, তাহার পূর্ব্বে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল,—তাহাহইলে আমাদের বক্তব্য এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বিংশতি-সংহিতাকারগণ অনেক সঙ্করবর্ণের নামও উৎপত্তি লিখিলেন, কিন্তু এ জাতির নাম লিখিলেন না কেন? সুতরাং বলিতে হইবে,

বেদব্যাস নূতন জাতির কথা লেখেন নাই। কোনও অর্ব্বাচীন ব্যক্তি এ শ্লোকের জন্য দায়ী।

আর একটী নূতন কথা,—১৫১০ খৃঃ আনন্দভট্ট বল্লালচরিত গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার গ্রন্থের ঊনবিংশ অধ্যায়ে শূদ্রবর্গে "ব্রাহ্মণাৎ শূদ্রকন্যায়াং নাপিতোনাম জায়তে" লিখিয়াছেন। নাপিত ও বারুজীবী এবং নিষাদ—ইহারা কি একজাতি? ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, বৃহদ্ধর্ম্ম ও আনন্দভট্টধৃত ব্যাসপুরাণ—কোন গ্রন্থ প্রামাণিক? বস্তুতঃ সবই অমূলক। কোনও কাণ্ডজ্ঞান-বিহীন অকালকুষ্মাণ্ডের বিদ্বেষ-বিষোদ্‌গার ব্যতীত এই শ্লোক অন্যকিছু নয়, একথা অনেক পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বেদব্যাসের লিখিত নহে,—একথা প্রাচীন পণ্ডিত মনুসংহিতার অনুবাদক ৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

আর একটীকথা সকলেরই চিন্তা করা আবশ্যক যে, বারুজীবী যদি সঙ্করবর্ণও হয়, (যদিও তাহা নহে) তথাপি তাম্বুলীজাতীয়া রমণী তাহার মাতা হইতে পারে না। কারণ তাম্বুলীজাতি খিলিব্যবসায়ী। খিলী প্রস্তুত করা এবং তদ্বিক্রয় তাম্বুলীর নিজস্ব। আর বারুজীবী জাতি পাণের উৎপাদক, বা পর্ণকৃষক। প্রাচীন কাল হইতে এই পর্য্যন্ত কোনও অন্যজাতিকে পাণ প্রস্তুত করিতে দেখা যায় না। এখানে চিন্তা করা দরকার, পর্ণকৃষক আগে, না খিলীওয়ালী আগে? বারুজীবীর মাতা তাম্বুলীবালা অবশ্য বারুজীবী-জন্মের পূর্ব্বেই জন্মিয়াছিলেন। তখন পাণচাষ অবশ্য ছিল। নচেৎ তিনি খিলী করিতেন কি দিয়া? যদি পাণচাষ ছিল, তবে কোন্ জাতি তাহা করিত? পর্ণকৃষকের মাতা খিলীওয়ালী, এরূপ বিকটকল্পনা 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তের' মত পুরাণেই শোভা পায়!

প্রক্ষিপ্ততার প্রমাণ শুধু এইটুকু নহে। আমরা বহুপূর্ব্বে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের জাত্যুৎপত্তি সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহাতে দেখিয়াছি "ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ব্ভে বারুজীবী জাতির উৎপত্তি হয়।" ব্রহ্মবৈবর্ত্তের সহিত যে ইহা মিলে না, একথা সকলেই বুঝি-তেছেন। কোন্ কথা সত্য? কোনটীই নহে, মনে করি। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকন্যার সন্তান বারুজীবী নহে, ইহাই আপাততঃ দেখান যাউক্। মনু বলেন—

"ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়াং অম্বষ্ঠো নাম জায়তে। নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে।" ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকন্যার সংসর্গজাত পুত্র পারশব বা নিষাদ। যাজ্ঞবল্ক, হারীত, গোতম, বশিষ্ঠ সকলেই এই এক কথা বলেন। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ বলেন, ঐরূপ সন্তান বারুজীবী। নিষাদ ও বারুজীবী এক নহে। নিষাদকে পাণের ব্যবসায় কোনও স্থানে দেওয়া হয় নাই। এখন আমরা দেখিতেছি, এই বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ অত্যন্ত আধুনিক ও ব্যাসের রচিত নহে, ইহা বহুপণ্ডিতের মত। মন্বাদি শাস্ত্রের অভিমত— অবশ্য ইহাপেক্ষা সহস্রগুণ গরীয়ান্। শাস্ত্রে আছে 'মন্বর্থবিপরীতা যা স্মৃতির্ন প্রসাশস্যতে।" মন্বর্থের বিরুদ্ধ বৃহদ্ধর্ম্মের অভিমত অপ্রমাণ। আরও দেখা যাইতেছে, বৃহদ্ধর্ম্ম খাঁটী উপপুরাণও নহে। অনেক পুরাণে উপপুরাণ-সংখ্যা-গণনা দৃষ্ট হয়, কিন্তু বৃহদ্ধর্ম্মের উল্লেখ দেখা যায় না। এখানিকে উপ-পুরাণের দলে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রামাণিকত্ব স্বীকার করিলেও দেখা যাইতেছে, মনু প্রভৃতির স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত এই উপপুরাণের বিরোধ হইতেছে, এরূপ অবস্থায় যাহা শাস্ত্রানুমোদিত, তাহাই সিদ্ধান্ত।

শাস্ত্র বলেন "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে। তত্র শ্রৌতং প্রমাণং স্যাৎ দ্বয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা।" যেখানে শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণে বিরোধ হইবে, সেখানে শ্রুতিরই প্রামাণ্য স্বীকার করা যায়। যেখানে স্মৃতি ও পুরাণ এই দুইটীর বিরোধ হইবে, সেখানে স্মৃতির প্রামাণ্য স্থির থাকিবে, পুরাণ অপ্রমাণ হইবে।

আর একখানি গ্রন্থ পরশুরামসংহিতা,—ইহাতেও বারুজীবীর উৎপত্তি সঙ্করবর্ণের মধ্যে বলা হইয়াছে। "গোপালাৎ তন্ত্র-বায্যাং বৈ বারুজীবশ্চ জায়তে। দত্বা পর্ণং মুনিভ্যশ্চ বারজীবত্বমীয়িবান্।" গোপা-লের ঔরসে তন্ত্রবায়-রমণীর গর্ভে বারুজীবের উৎপত্তি। ইহারা মুনিদিগকে পর্ণ দান করায় বারুজীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই পরশুরামসংহিতা কোনও সংহিতাকার মহর্ষির প্রণীত নহে। গ্রন্থখানি একেবারে হাতগড়া। এ গ্রন্থকে কোনও প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ টীকাকার প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। আমরা গোপালভট্টের বল্লালচরিতে এই সংহিতাকে প্রাক্‌গুপ্ত দেখিতেছি। কিন্তু কি দুরদৃষ্ট, সেই বল্লালচরিতেই পুরাণান্তর-মতে জাতির

উৎপত্তি দেখাইতে গিয়া "ব্রাহ্মণস্তু চ তাম্বুল্যাং পুত্রোঽসৌ বারুইঃ স্মৃতঃ।" এই বচনটী লেখা হইয়াছে। বারুই-জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই শ্লোকটী সেই ব্রহ্মবৈবর্ত্তের শ্লোক। ইহার আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি। এখন বলিতে চাহি, কাহার কথা সত্য? বৃহদ্ধর্ম্মকার, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-রচয়িতা এবং পরশুরাম, ইহার মধ্যে কে প্রকৃত কথা বলিয়াছেন? সকলেই নূতন এক একরকম লিখিলেন, কিন্তু 'সত্য' ত আর বহুবিধ হইবে না! যদি ঐ সকলবিধ উৎপত্তি সত্য হয়, তবে জন্ম ভিন্নরূপ হওয়ায়—এই ত্রিবিধ প্রকারে জাত জাতিত্রিতয় একনামধারী হইলেও এক জাতি নয়। কে কি, তাহা অনির্দ্দিষ্ট। বস্তুতঃ এইসকল মূলশূন্য বিরুদ্ধমত পরস্পরের সংঘাতে অসত্য বলিয়া প্রতীত হয়। ইহাদের মধ্যে যদ্যপি কিঞ্চিৎ সত্য থাকিত, তাহা হইলে এই সকল মত মানবধর্ম্ম-শাস্ত্রাদির বিরুদ্ধ হইত না।

শাস্ত্রে আছে "পরস্পর বিরোধে হি ন প্রকারান্তরস্থিতিঃ"। পরস্পর বিরোধ হইলে, কোনও প্রকারের প্রামাণ্য পরিরক্ষিত হইতে পারে না। আর একটী কথা এই যে, কেবল শাস্ত্রদ্বারা তথ্যনির্ণয় হইতে পারে না। যেস্থানে শাস্ত্রবাক্য সন্দিগ্ধ হইবে, সেখানে যুক্তিদ্বারা সত্য স্থির করিতে হয়। "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোঽর্থনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।" এই বৃহস্পতিবচনে যুক্তিদ্বারা শাস্ত্রীয় তথ্য নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা আছে। এ সম্বন্ধে আমরা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণাদি গ্রন্থে যে সকল মত পাইয়াছি, তাহার সকলই অযৌক্তিক। প্রামাণিক স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত বিরোধ এবং প্রামাণিক রামায়ণাদি গ্রন্থে অনুল্লেখ দ্বারা ইহার অযৌক্তিকতা স্থির করিতে পারা যায়। এই সকল পরস্পর-বিরুদ্ধ মত প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ সকলেরই মূল্য সমান!

এই জাতির আচার-ব্যবহারাদি ও অন্যান্য ব্যবস্থা পর্য্যালোচনায় ইহারা 'বৈশ্য'—এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়। সঙ্কর বা অন্ত্যজদিগের মত নীচতা বা অনার্য্যতা এজাতির নাই। ইহারা কৃষিবাণিজ্যজীবী জাতি। প্রাচীনকাল হইতে সর্ব্ববিধ শাস্ত্রেই কৃষিবাণিজ্য বৈশ্যবৃত্তি বলা হইয়াছে। অতএব বৈশ্যবৃত্তি বা বৈশ্যোচিত গুণকর্ম্ম—বৈশ্যত্বই প্রমাণ করে। সঙ্করত্ব-জ্ঞাপক মতের সারবত্তা আজকাল কোনও

পণ্ডিতই স্বীকার করেন না। এ মতের দুর্ব্বলতা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তবে এমত স্বীকার করিলেও আমাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির অসুবিধা হয় না, ইহা প্রতিপাদিত হইল। প্রাচীনকালে এই বারুজীবী জাতির স্বতন্ত্র নাম ছিল না, কারণ তখন ইহাদিগকে বিশ্‌ বা বৈশ্যই বলা হইত। পরে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ানুসারে শাখাভেদ সংঘটিত হওয়ায়, বহুকালপরে তাম্বুলী, গন্ধবণিক্‌, বারুজীবী বৈশ্য প্রভৃতি জাতি সংজ্ঞের প্রাচীন একত্ব বা বৈশ্যত্ব ভুলিয়া গিয়া, কখনও শূদ্র, কখনও সৎশূদ্র, কখনও বা সঙ্কর ইত্যাদি রূপে আপনাদিগকে অভিহিত করিয়া আসিতেছে। স্বার্থপর-ব্যক্তিগণের দ্বারা বিরচিত অমূলক বচন সকলের মধ্যে যে ইহাদের সর্ব্বনাশের বীজ লুক্কায়িত ছিল, ইহারা তাহা জানিত না স্ব স্ব ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায় এবং শাস্ত্রালোচনার অভাবে, ইহারা ঐ সকল সংবাদ জানিতে পায় নাই। সময়ক্রমে জানিয়াও প্রতীকারে কৃতকার্য্য হয় নাই; পক্ষান্তরে স্বীয় বর্ণাচারও ত্যাগ করে নাই। এই সকল জাতি-বিপ্লবের গোঁজামিল—অধুনা শাস্ত্রচর্চ্চার সাহায্যে, অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করা হই-তেছে। প্রকৃতপক্ষে মহামান্য নিরপেক্ষ সত্যপূর্ণ শাস্ত্র ও শাস্ত্রকর্ত্তা কখনই এই সকল জাতিকে শূদ্র বা সঙ্কর বা অন্ত্যজ বলেন নাই। সৎশাস্ত্রে ও সুপণ্ডিতসমাজে, ইহারা চিরদিনই 'বৈশ্য' স্বরূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। স্বার্থপর অদূরদর্শী শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোকের দ্বারা প্রস্তুত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ যুক্তিবিরুদ্ধ শ্লোকগুলি সত্যের কিছুই ক্ষতি করিতে পারে নাই, ইহা প্রমাণিত হইল। অধিক প্রমাণ দিবার দরকার দেখি না; শাস্ত্রমতে ধর্ম্মমতে যুক্তিমতে ইহাদের 'বৈশ্যত্ব' স্থির। শূদ্রত্ব বা সঙ্করত্ব আরোপিত অসত্য অন্যায়। এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমরা এপ্রসঙ্গে বিশ্রামলাভ করিলাম।

নবশাখ ও সৎশূদ্র রহস্য।

অধুনা আমাদের সম্মুখে কয়টী সমাজপ্রচলিত শব্দ সমুপস্থিত। তাহাদের মধ্যে কতটুকু সত্য আছে, তাহার অনুসন্ধান না করিলে, আমরা সকল আপত্তি হইতে রক্ষা পাইতে পারি না। সেই কয়টী শব্দ এই—নবশাখ, নবশায়ক ও সৎশূদ্র। এই কয়টী শব্দের রহস্য বিশ্লেষণ না করিয়া, আমরা এখনও অনেকটা অনাবিষ্কৃত তথ্যের প্রতি ঔদাস্য প্রদর্শন করিতেছি।

যে বারুজীবী জাতিকে আমরা ইতঃপূর্ব্বে বৈশ্যবর্ণান্তর্ভুক্ত বলিয়া স্থির করিয়া আসিলাম, তাহাদিগকে অনেকে নবশাখ, নবশায়ক বা সৎশূদ্র বলিতে চাহেন। এই শব্দসকল আমাদের সিদ্ধান্তের বিরোধী কিনা, তাহাই প্রথমে দেখিতে চাহি।

প্রথমে দেখা যাইতেছে—'গোপনাপিত-ভালাশ্চ তথা মোদক-কূবরৌ। তাম্বূলি-পর্ণকারৌ চ করণা বণিগাদয়ঃ। এতে সৎশূদ্রজাতাশ্চ নবশাখাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।' এই শ্লোকে 'পর্ণকার' শব্দের অর্থ পর্ণপ্রণেতা বারুজীবী, এখানে ইহারা সৎশূদ্র ও নবশাখ নামে পরিচিত। 'সৎশূদ্র' বিষয়ে পরে আলোচিত হইবে, সম্প্রতি 'নবশাখ' শব্দ বিবেচিত হউক্। এই নবশাখ-শব্দের অর্থ কি নয়টী জাতির সম্মিলন? অবশ্য সংখ্যাগণনায় তাহাই দেখা যাইতেছে। কিন্তু এই নয়টী জাতির এমন কিছু সাম্য পাওয়া যায় না, যাহাদ্বারা ইহাদিগকে স্বতন্ত্র 'নবশাখ' সম্প্রদায়রূপে গণ্য করার কারণ থাকিতে পারে। এই শ্লোক উদ্ভট, ইহা কোনও শাস্ত্রীয় গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।

আর একটী বচন আছে "গোপালতৈলিকস্তন্ত্রী মালী মোদক-বারুজী। কুলালঃ কর্ম্মকৃৎ কুন্দো নবশাখাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" এখানে 'বারুজী' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এ শ্লোকে যে সকল জাতি নবশাখান্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত, প্রথমোক্ত শ্লোকটীতে তদপেক্ষা বিভিন্ন জাতি এই নামে অভি-হিত, বচনগুলি কি প্রাদেশিক? এ সকল বচনের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, পরস্পর বিরোধ হয়, কোনটী যথার্থ? এ শ্লোকটীও মূলশূন্য, ইহাও কোনও শাস্ত্রগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।

আর দুটী শ্লোক আছে "মালাকারঃ কর্ম্মকারঃ শঙ্খকারঃ কুবিন্দকঃ। কুম্ভকারঃ কাংস্যকার এতে ষট্ শিল্পিনোবরাঃ। সূত্রধারঃ চিত্রকারঃ স্বর্ণকারঃতথৈবচ। গৌণকল্পশ্চ বিজ্ঞেয়ো নবশাখঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দ, কুম্ভকার, কাঁসারী, সূত্রধর, চিত্রকর, স্যাঁকরা এই কয়টী গৌণকল্প নবশাখ। এ শ্লোকের সহিত কোনও শ্লোকের মিল নাই, অধিকন্তু এটীও শাস্ত্রে নাই। ইহাতে বারুজীবীর নামও নাই। প্রথমটী ও তৃতীয়টী "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা" এবং

দ্বিতয়টী "কলিকাতারিভিউ" কর্ত্তৃক উদ্ধৃত। ইহার সকলগুলিই হাতগড়া, কোনও প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থের নহে, অতএব এগুলি উপেক্ষণীয়।

এক্ষণে 'নবশায়ক' শব্দের মৌলিকতা অনুসন্ধান করা যাউক্। পরশুরাম যখন পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন, তখন তিনি নাকি নয়টী জাতির সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন! এই জাতিসকল শায়ক বা বাণের ন্যায় তাঁহার স্বার্থসাধন শত্রুনিধন করিয়াছিল। এজন্য তিনি ঐ সকল জাতিকে 'শায়ক' নামে অভিহিত করেন, এ'ই কারণে ঐ নয়টী জাতি নবশায়ক নামে পরিচিত, এরূপ গল্প আছে। ইহার মৌলিকতা কিছুই নাই, নবশায়ক শব্দ শাস্ত্রীয়ও নহে।

"গোপমালী তথা তৈলী তন্ত্রীমোদক-বারুজী। কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ।" এই বচনটী দেশবিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে পরাশর-সংহিতার নামে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পরাশর-সংহিতা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াও ঐ শ্লোক পাওয়া গেল না। এরূপ উদ্‌ভট শ্লোকের প্রামাণ্য কি? "কলিকাতা-রিভিউ" আর একটী উদ্‌ভট শ্লোক প্রচার করিয়াছে, তাহা এই "তৈলী গোপস্তথা মালী তাম্বুলী বণিক্ বারুজী। কুম্ভকারঃ কর্ম্মকারো নাপিতো নবশায়কাঃ।" এ শ্লোকের রচয়িতা পাওয়া যায় না। কোনও শাস্ত্রীয় গ্রন্থেও এশ্লোক দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার সোনায় সোহাগা! দ্বিতীয় চরণে ছন্দোভঙ্গও আছে। এ সকল বাজে বচনের দ্বারা যে সত্যের সন্নিহিত হওয়া যায় না, তাহা সকলেই চিন্তা করিতে পারেন। এই নবশায়ক শব্দ মূল ধরিয়া, তাহাকে সংক্ষেপে বা অপভ্রংশে "নবশাখ" করিতে অনেকে ইচ্ছুক। তাঁহাদের কথার উত্তর এই যে—বরঞ্চ সমাজপ্রচলিত নবশাখা বা নবশাখ শব্দে কিছু সত্য থাকিতে পারে, তথাপি অশাস্ত্রীয় ও অপ্রচলিত অমূলক 'নবশায়ক' শব্দের সহিত সত্যের কণিকামাত্র সংস্পর্শও নাই।

গোপালভট্টকৃত বল্লালচরিতে "গোপমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক-বারুজী। কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ। তৈলিকো গান্ধিকোবৈদ্যঃ সচ্ছূদ্রাশ্চ প্রকীর্ত্তিকাঃ। সচ্ছূদ্রানান্তু সর্ব্বেষাং কায়স্থ উত্তমঃস্মৃতঃ।" এই শ্লোক দুটীর সাহায্যে একপ্রকার নবশায়ক ও সৎশূদ্রের কথা প্রমাণিত হয়। এই নবশায়ক বা সৎশূদ্রগণের মধ্যে বারুজীবীর নাম নাই, তথাপি

আমরা এ শ্লোকের মৌলিকতা স্বীকার করি না। এ সকল পরস্পর-বিরুদ্ধ শ্লোকের কোনটী প্রমাণ নহে। ইহার একটী কথা—অর্থাৎ নবশাখ বা নবশায়ক—ইহার কোনটী, সংহিতা, বা পুরাণাদি প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। অর্ব্বাচীনরচনা ব্যতীত ইহা আর কিছুই মনে হয় না। নবশাখা বা নবশাখ শব্দ, বাঙ্গালার সমাজে চলিত আছে, উহাকে সংস্কৃত পৌরাণিক-পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া 'নবশায়ক' করা হয়। সংস্কৃত হইতে গেলে একটু পৌরাণিক গল্পও তাহার সহিত মিশাইয়া দিতে হয়, কাজেই পরশুরাম শুদ্ধ উপস্থিত করা হইল।

প্রকৃতপক্ষে নবশাখ অর্থ নয়টী জাতি নহে। নব অর্থ নূতন। একটী নূতন শাখা। এই সকল জাতির কতকগুলি (অবশ্য নয়টী নহে) প্রাচীনকালে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়া একটী নূতন শাখা গঠিত করে। পরে বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে, সেইভাবেই হিন্দুসমাজে গৃহীত হয়। বৌদ্ধ হইয়া ইহারা উপবীতাদি ত্যাগ করিয়াছিল, সদাচার বা স্বজাতি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিল না। সেই নবীন শাখা যখন হিন্দুসমাজে মিশিয়া গেল, তখন নবশাখা শব্দ হিন্দুসমাজের আভিধা হইল। পরে অজ্ঞলোকে ঐ কথার প্রকৃতমর্ম্ম না জানিয়া, উহাদিগকে 'সৎশূদ্র' আখ্যা দিল। সৎশূদ্র অর্থ কখনই শূদ্র নহে। আচারব্যবহার ব্যবসায় ধর্ম্মাদিতে উৎকর্ষ দেখিয়া, এবং যজ্ঞোপবীতের অভাব দর্শনে, উভয় কারণ অবলম্বনে 'সৎ-শূদ্র' নাম হইল। নবশাখ কথা রহিল, কিন্তু তাৎপর্য্য না জানিয়া অজ্ঞ পণ্ডিতম্মন্যগণ নয়টী বিভিন্ন জাতিকে সুবিধামত ভাবে (যাহার যেরূপ ইচ্ছা হইল) গ্রহণ করিয়া, নবশাখ নামের মূলভিত্তিস্বরূপে অর্ব্বাচীন গ্রন্থে প্রক্ষেপ করিল। পরে নবশাখ শব্দ নবশায়কে পরিণত হইয়া, পুরাণের রূপান্তরে জনসমাজে ভ্রমের বীজ বপন করিল। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এইরূপ বলেন, ইহা যথেষ্ট যৌক্তিকও বটে।

আমরা সংক্ষেপে বলিতে চাহি, নবশাখ বা নবশায়ক ইত্যাদি শব্দ জাতিবাচক নহে। ঐ শ্লোকগুলিও প্রামাণিক নহে। কথঞ্চিৎ প্রামাণিকতা স্বীকার করিলে, যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা আমরা এইমাত্র বলিয়াছি। সৎশূদ্রজ্ঞাপক বচনগুলি

উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ-কলেবর বর্দ্ধিত করিব না। আনন্দভট্টের "নবশায়ক" বা "সৎশূদ্র" মধ্যে বৈদ্য, কায়স্থ পর্য্যন্তও আছেন, কিন্তু বারুজীবী নাই, কিন্তু নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকাধৃত নবশাখ-জ্ঞাপক যে উদ্ভটশ্লোক আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে বারুজীবীকে সৎশূদ্র বলা হইয়াছে। আমরা এই সৎশূদ্রত্ব স্বীকার করিয়া বলিতে পারি যে, বৌদ্ধমার্গাবলম্বনের পরে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগের জন্য ইহাদিগকে "সৎশূদ্র" বলা অসঙ্গত নয়। বারুজীবী জাতির মধ্যে অনেকে যে বৌদ্ধমার্গী ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে।

ধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্মরাজের দ্বাদশসেবক মধ্যে বারুজীবী-জাতীয় শিবদত্ত একজন প্রধান। ধর্ম্মমঙ্গলে আছে "মহাভক্ত সেবক ছিল বারুই শিবদত্ত। ধর্ম্মপূজা করিল সে অতি সুমহত্ত।" আর একজন ধর্ম্ম-সেবক বারুজীবীর নাম সুধদত্ত। প্রমাণ যথা—"উৎসপুরে সুধদত্ত বারুইনন্দন। করিছে ধর্ম্মের পূজা মজাইয়া মন। গাজন লইয়া এল ময়নামণ্ডলে। শিরে ধর্ম্ম-পাদুকা সোনার চতুর্দ্দোলে।" এই ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধধর্ম্মের সামগ্রী। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ—এই তিনটী বৌদ্ধধর্ম্মের সেবকগণের আশ্রয়। বৌদ্ধ হইতে হইলে, প্রত্যেকের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের শরণাগত হওয়া নিয়ম ছিল। এই ধর্ম্মসেবকগণ বৌদ্ধই ছিলেন। স্মার্ত্তবাগীশ রঘুনন্দন মহোদয় ষষ্ঠী, শীতলা, সুবচনী ও ছাড়েন নাই, কিন্তু ধর্ম্মঠাকুরের পূজা লেখেন নাই। হিন্দুর প্রাচীন পুস্তকে কোনও স্থানে 'ধর্ম্ম' নামে দেবতার সংবাদ পাওয়া যায় না।

বরাহপুরাণে "অথোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মস্য মহতোনৃপ! মাহাত্ম্যঞ্চ যথৈকেন তন্নিবোধ নরাধিপ!" ইত্যাদি শ্লোকে শ্বেতমাল্যানুলেপনধারী 'ধর্ম্ম'-পুরুষের আবির্ভাব উল্লিখিত আছে। ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গ হইতে 'ধর্ম্ম' উদ্ভূত হন, এরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বরাহপুরাণের এই "ধর্ম্মঠাকুর" প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের দ্বারা প্রকাশিত। বরাহপুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের একখানি, নিতান্ত নবীনগ্রন্থ নহে। এই গ্রন্থে যদি 'ধর্ম্ম'দেব ও তাঁহার পূজার কথা থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্মার্ত্তগণ তাহার উল্লেখ করিতেন। শাস্ত্রীয়, ব্যবহারপ্রাপ্ত, উক্ত অনুক্ত বহুবিধ দেবতার পূজাদির কথা যাঁহারা লিখিয়া গেলেন, তাঁহারা 'ধর্ম্ম'কে জানিতেন না। পরবর্ত্তীকালে হিন্দুসমাজের অজ্ঞ আচার্য্যগণ

বৌদ্ধ ধর্ম্মপূজায় শাস্ত্রীয় প্রমাণস্বরূপ শ্লোক বরাহপুরাণে প্রপেক্ষ করেন। ইহাই অনেক পণ্ডিতের মত।

মোটের উপর বারুজীবী জাতির মধ্যে অনেকে বৌদ্ধ ছিলেন, প্রমাণ পাওয়া গেল। এই বৌদ্ধ বারুজীবীগণই বারুজীবীর সৎশূদ্র হইবার কারণ। অন্যান্য সৎশূদ্র জাতি সম্বন্ধেও এইরূপ। সৎশূদ্র মধ্যে বৈশ্য ও কায়স্থের নাম আছে। প্রকৃতপক্ষে এই দুই জাতি যেমন শূদ্র নহে, অনেকাংশে আচারাদির ব্যতিক্রম হওয়ায়, ক্ষত্র-বৈশ্যোচিত সমস্ত সংস্কার সম্পূর্ণ না হওয়ায় "সৎশূদ্র" নামে অভিহিত হইয়াছে, বারুজীবীরাও তেমনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করায়, অনেকাংশে বৈশ্যোচিত-সংস্কার-বিহীন হওয়ায় সৎশূদ্র সংজ্ঞা পাইয়াছে। ফলতঃ 'সৎশূদ্র' কথার অভ্যন্তরে ইহাদের বৈশ্যত্বের প্রচ্ছন্নবীজ রহিয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বারুজীবী জাতিকে 'সঙ্করবর্ণ' বলিয়াও 'সৎশূদ্র' বলিতে বিস্মৃত হন নাই। কায়স্থ ও বৈশ্যের সহিত একত্রে সৎশূদ্র হইতে বারুজীবীজাতির আপত্তি নাই, কিন্তু 'সৎশূদ্র' অর্থে ইহাদের বৈশ্যত্ব ক্ষুণ্ণ (সংস্কারাভাবে) এরূপ বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে এই অনুসন্ধান-মূলক সত্য স্বীকার করিলেও এইজাতি বৈশ্যোচিত সদাচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং জীবিকা ত্যাগ করে নাই বলিয়া, ইহারা বৈশ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যজ্ঞোপবীতাদির বা উপনয়নসংস্কারের অভাব বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণেতর-জাতি মাত্রেরই হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগেরও সংস্কার নামমাত্র হয়, সংস্কারের মঙ্গলময় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এরূপাবস্থায় সংস্কার হওয়া বা না হওয়া একই কথা। কেবল বাহ্যচিহ্ন যজ্ঞোপবীতধারণে কেহ কখনও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে নাই। এজাতির (বারুজীবীর) বাহ্যচিহ্ন না থাকুক, কিন্তু অন্তঃশৌচ অক্ষুণ্ণ আছে,—একথা গুণবান্ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ প্রত্যক্ষ করেন, স্বীকারও করেন। এই জাতির গুণকর্ম্ম বিদ্যমান্, ইহা বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন করে। বাহ্যচিহ্নের অভাবে 'সৎশূদ্র' নাম পাইলেও সেই নামই বৈশ্যত্বজ্ঞাপক, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাহা হউক্, নবশাখ প্রভৃতি শব্দের রহস্য বিচার করিয়াও আমরা জ্ঞাত হইলাম, বারুজীবীজাতি কায়স্থ ও বৈশ্যের সমানশ্রেণীস্থ। ইহাদের বৈশ্যত্ব-জ্ঞাপক প্রমাণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে, অধুনা দেখা গেল,

"সৎশূদ্র" শব্দ ইহাদিগকে বুঝাইলেও ইহারা শূদ্র নহে, বৈশ্য। নবশাখ শব্দের আলোচনায় দেখিলাম, কোনও শাস্ত্রকার বারুজীবীকে নবশাখ বলেন নাই। উহা হইতে কেবল এ জাতির মধ্যে বৌদ্ধ থাকায় অনুমান হয়। এতাবতা স্থির হইল, বারুজীবী শূদ্র নহে বৈশ্য।

শাস্ত্রে সৎশূদ্রের স্থান।

'সৎশূদ্র' সম্বন্ধে আমরা আর একটু অন্যভাবের আলোচনা করিতে পারি, তাহাতেও অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। সৎশূদ্র কথার অর্থ সাধু বা শ্রেষ্ঠ শূদ্র। আমরা প্রাচীনকালের শূদ্রসমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিব, "শূদ্র" শব্দ সকলস্থানে নীচ অনার্য্যবর্গকে লক্ষ্য করে নাই। শাস্ত্রে বেদোক্ত পঞ্চযজ্ঞাধিকারবান্ শূদ্রের উল্লেখ আছে। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদিগের ভোজনপাত্রে ভোজন করিবার অধিকারী ছিল। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ববিধ শূদ্রভোজনপাত্র পরিত্যাগ করিতেন না। শূদ্রের সহিত ব্রাহ্মণ একস্থানে ভোজন করিতে অসম্মত হইতেন না। কোনও কোনও শূদ্রের প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জনাদিও ব্রাহ্মণগণ ব্যবহার করিতেন। শূদ্রসমাজের এক সম্প্রদায় বেদ পাঠ করিতেন। এই সকল অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে, কে না বলিবেন যে বেদোক্ত-কর্ম্মাধিকারী শূদ্রগণ সৎশূদ্র?

আমরা এই প্রস্তাবিত সত্যের আকর অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই খৃষ্টাব্দের ১৫০ বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী পাণিনীয় মহাভাষ্যে পতঞ্জলি ইহার পরিস্ফুট বর্ণনা দিয়াছেন। "শূদ্রানামনিরবসিতানাং" এই পাণিনীয় সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মহাভাষ্যে শূদ্রসম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। সূত্রটীর অর্থ এইরূপ "অনিরবসিত" শূদ্রজাতি-বাচক পদদ্বয়ের দ্বন্দ্বসমাস করিলে, ঐ দ্বন্দ্ব-সমস্ত পদের উত্তর একবচন প্রয়োগ করিতে হইবে। এখানে 'অনিরবসিত' কথাটীর অর্থ কি? ইহাই লইয়া এ প্রস্তাবিত তর্কের আবির্ভাব। অনিরবসিত অর্থ—যাহারা নির্ব্বাসিত অর্থাৎ বহিষ্কৃত বা বিতাড়িত নহে—তাহারা।

এখন জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, কোথা হইতে বহিষ্কৃত নহে? ইহার প্রথম উত্তর "আর্য্যাবর্ত্তভূমিতঃ" অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি হইতে। এখানে প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে—আর্য্যাবর্ত্ত কাহাকে বলে? ভাষ্যে উত্তর

দেওয়া হইয়াছে—"আদর্শপর্ব্বতের পূর্ব্বে, কালকবন-পর্ব্বতের পশ্চিমে, হিমবৎপর্ব্বতের দক্ষিণে এবং পারিযাত্রপর্ব্বতের উত্তরে যে স্থান, তাহাকে আর্য্যাবর্ত্ত কহে।" এই প্রথম ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না, ইহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এই "কিষ্কিন্ধ্যাগান্ধিকম্" "শকযবনম্" "সৌর্য্যক্রৌঞ্চম্" এই সকল দ্বন্দ্ব-সমস্ত-পদে একবচন-প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই সকল প্রয়োগে যে সকল শূদ্রজাতির উল্লেখ আছে, তাহারা আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বহিষ্কৃত। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বহিষ্কৃত শূদ্র-পদের দ্বন্দ্বসমাসে এক-বচন হইতেছে, অতএব অনিরবসিত শব্দের অর্থ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে অবহিষ্কৃত নহে।

প্রথম ব্যাখ্যা নির্দ্দোষ না হওয়ায়, দ্বিতীয় ব্যাখ্যার অনুসরণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে "আর্য্যনিবাসাৎ" আর্য্যনিবাস হইতে যাহারা বহিষ্কৃত নহে, তাহারা অনিরবসিত। এ ব্যাখ্যাও ভাষ্যকার যুক্তি-যুক্ত মনে করেন নাই। কারণ এ ব্যাখ্যায়ও দোষ আছে। দোষ এই যে, আর্য্যনিবাস (আর্য্যদের নগর অথবা পণ্যস্থান বা গ্রাম) হইতে যাহারা বহিষ্কৃত নহে, সেই সকল শূদ্রজাতিবাচক শব্দের দ্বন্দ্ব-সমাসে সকলস্থানে একবচন হয় না। চণ্ডাল এবং মৃতপ এই শূদ্রজাতিদ্বয় আর্য্যগ্রাম, নগর, পণ্যস্থান ইত্যাদি কোনওবিধ আর্য্যনিবাস হইতে বহিষ্কৃত নহে, কিন্তু দ্বন্দ্বসমাসে 'চণ্ডালমৃতপং' হয় না, 'চণ্ডালমৃতপৌ' হয়। সুতরাং এরূপ অর্থ করিলে, লক্ষ্যস্থানের বহির্ভাগেও লক্ষণের গমন হইল। অতএব এরূপ ব্যাখ্যাও পরিত্যক্ত হউক।

অতঃপর ভাষ্যকার তৃতীয়-প্রকার ব্যাখ্যার আলোচনা করিয়াছেন। তৃতীয় ব্যাখ্যা এই যে 'যজ্ঞাৎ কর্ম্মণঃ' অর্থাৎ যাহারা যজ্ঞকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত নহে, তাহারাই অনিরবসিত। এ অর্থও সঙ্গত নহে, কারণ 'তক্ষায়স্কারং' 'রজকতন্তুবায়ং' এই সকল দ্বন্দ্ব-সমস্ত পদ একবচনান্ত, কিন্তু এই পদবর্ণিত শূদ্রজাতি যজ্ঞকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত। লক্ষণের অব্যাপ্তিশঙ্কায় এ ব্যাখ্যাও পরিত্যক্ত হইল।

এইবার ভাষ্যকার চতুর্থ ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্তমত বলিতেছেন। সেই মত এই "ভোজনপাত্রতঃ" অর্থাৎ যাহারা আর্য্যগণের ভোজনপাত্র হইতে বিতাড়িত হয় নাই, তাহারা "অনিরবসিত"। এখানে আর কোনওরূপ দোষের

সম্ভাবনা নাই। আর্য্যগণের ভোজনপাত্র হইতে যাহারা বিতাড়িত হয় নাই, অর্থাৎ যাহাদের সহিত আর্য্যগণ একপাত্রে ভোজন করিতে অসম্মত হন না, সেই সকল শূদ্রজাতিবাচক শব্দের দ্বন্দ্বসমাসে একবচন হয়। "কিষ্কিন্ধাগান্ধিকম্" এখানে একবচন হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে কিষ্কিন্ধা বা গান্ধিক জাতি আর্য্যভোজনপাত্র হইতে বিতাড়িত নহে। "চণ্ডাল-মৃতপং" হয় না, যথার্থতঃ চণ্ডাল এবং মৃতপ এই জাতিদ্বয় আর্য্যভোজন-পাত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত। .

এ ব্যাখ্যাচতুষ্টয়ের আন্দোলনে আমরা দেখিলাম, আর্য্যাবর্ত্ত এবং তাহার বহির্ভাগে শূদ্রজাতি বাস করিত আর্য্যনিবাস অর্থাৎ আর্য্যদিগের গ্রাম-নগরাদিতেও শূদ্রগণের বাসের অধিকার ছিল। কতকগুলি শূদ্র আর্য্যদিগের সহিত একপাত্রে ভোজনের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইত।

ভাষ্যব্যাখ্যাতা কৈয়ট লিখিয়াছেন "শূদ্রাণাম—পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানেঽধিকারোঽস্তীতিভাবঃ।" ইহার অর্থ—শূদ্রেরা পঞ্চযজ্ঞ-অনুষ্ঠানে অধিকারী, এইরূপ তাৎপর্য্য। পঞ্চযজ্ঞ সম্বন্ধে মনু বলেন,—"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমোদৈবোবলির্ভৌতোনৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।" পঞ্চযজ্ঞের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ। ইহার মধ্যে অধ্যাপন অর্থাৎ বেদপাঠন ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোমকার্য্য দেবযজ্ঞ এবং অতিথি-সৎকার নৃযজ্ঞ। এখন ভাবিয়া দেখা যাউক, একশ্রেণীর শূদ্র এই পঞ্চযজ্ঞের অধিকারী, ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কি! সকলেই চিরকাল জানেন যে—শূদ্র বেদের অধিকারী নয়, মহাভাষ্যের কৈয়ট ব্যাখ্যাতা বলিতেছেন, শূদ্রেরা পঞ্চ-যজ্ঞ করিত পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ বেদপাঠন। কি দুরূহ সমস্যা! যাহাদের বেদপাঠে অধিকার নাই বলিয়া, আধুনিক শাস্ত্র কোলাহল করি-তেছেন, সেই শূদ্র পঠন নয়—পাঠনের, শিষ্যত্বের নয়—আচার্য্যত্বের অধিকারী!

আমরা অবশ্য ইহার মীমাংসায় বলিব, ইহা নূতন কথা নহে। অজ্ঞ শূদ্র বেদের অধিকারী না হইতে পারে, শাস্ত্রে 'সৎশূদ্র' নামে অভিহিত কায়স্থ বৈদ্য, গন্ধবণিক প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকুলোৎপন্ন জাতিরা বেদাধ্যয়ন এবং বেদাধ্যাপন উভয়েরই অধিকারী। বস্তুতঃ চণ্ডাল মৃতপ প্রভৃতি অনার্য্য শূদ্রগণ এতদুভয়ের কিছুরই অধিকারী নহে। এরূপ মীমাংসা

করিলে প্রাচীন এবং আধুনিক উভয়বিধ শাস্ত্র-গ্রন্থের একবাক্যতা হয়। ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। বেদশাস্ত্র প্রচার-গুরু কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন "সম্ভবত্যেক-বাক্যত্বে বাক্যভেদো ন যুজ্যতে।" উভয়ের মধ্যে যদি আপাতবিরোধ উপস্থিত হয়, তবে সেখানে একবাক্যতা সম্ভব হইলে, বাক্যভেদ স্বীকার করিবে না। কেননা, বাক্যভেদ একটী প্রবল দোষ। দোষ স্বীকার করাপেক্ষা উভয়েরই উদ্দেশ্য বা অধিকারভেদে একবাক্যতা করিয়া, দুয়ের প্রামাণ্য-রক্ষাই মুখ্যকল্প।

এখানে বুঝিতে পারিলাম, বারুজীবী জাতি যখন কোনও কোনও শাস্ত্রগ্রন্থে 'সৎশূদ্র' নামে কথিত হইয়াছে, আর মহর্ষি পতঞ্জলি এবং কৈয়টাচার্য্য যখন বেদাধ্যাপনে অধিকারী শূদ্রের কথা বলিয়াছেন, তখন অবশ্যই বারুজীবীজাতি প্রাচীনকাল হইতে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের অধিকারী ছিল, ইহা প্রতিপন্ন হয়। পতঞ্জলি বা কৈয়টাচার্য্যের বর্ণিত শূদ্র সৎশূদ্র, নিকৃষ্টশূদ্র নহে।

এই সকল জাতি বেদাধিকারী হইয়া এবং যথোচিত আচারবান্ হইয়াও, যে কারণে যজ্ঞোপবীতবিহীন হইয়াছে, তাহা আমরা এই গ্রন্থে ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি। ঐ বর্ণিত কারণের পুনরুল্লেখে সংক্ষেপে বলি, উহা ঐ জাতীয় কতিপয় প্রধানব্যক্তির বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের পরিণাম। কোন কোনও প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন যে—বল্লাল কর্ত্তৃক বারুজীবীরও যজ্ঞোপবীত ছিন্ন হয়। বারুজীবী জাতি বংশোচিত উপাধির সহিত 'দাস' সংযুক্ত করিয়া নাম বলেন না, কৌলীন্যপ্রথাও ইহাদের মধ্যে নাই। বল্লাল 'দাস' স্বীকার না করায়, এই জাতির মধ্যে কাহাকেও কুলীন করেন নাই, অপিচ ইহাদের যজ্ঞোপবীতচ্ছেদ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা বোধহয় অসঙ্গত নয়। অধুনাতন তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কিন্তু এই কথাই বলেন। যে কারণেই হউক্, পাণিনীয় মহাভাষ্যের পঞ্চযজ্ঞাধিকারী শূদ্র 'সৎশূদ্র'। কায়স্থ, বৈদ্য, বারুজীবী প্রভৃতি এই সৎশূদ্রের মধ্যে পরিগণিত।

এখন নিঃশঙ্কভাবে বলিতে পারি, অতি প্রাচীন এবং আধুনিক কালেও বারুজীবী জাতিকে সদাচার-সম্পন্ন উচ্চতর বৈশ্য-শাখায় পরিগণিত দেখিয়া

আসিতেছি। কথনও বেদানধিকারী অনার্য্য শূদ্রশাখার মধ্যে ইহাদের নামোল্লেখ কোনও শাস্ত্রে নাই।

বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বারুজীবীজাতির লোকসংখ্যা।

জেলা	সংখ্যা	জেলা	সংখ্যা
বর্দ্ধমান	৩১৩৫	বীরভূম	২০০৯
বাঁকুড়া	৩৪০৫	মেদিনীপুর	৫৫১৮
হুগলী	৩৪৬৯	হাবড়া	৬০৮২
২৪ পরগণা	৫৭৪৫	নদীয়া	৩১৭৮
মুর্শিদাবাদ	২১১৮	যশোহর	১০৫৬২
খুলনা	১৫৪৮৫	রাজসাহী	৬০৮
দিনাজপুর	১৭৪১	রঙ্গপুর	১৪১৬
বগুড়া	৪২০	পাবনা	২৭১১
ঢাকা	৩০৫৯৬	ফরিদপুর	৯৬৯২
বরিশাল	১৩৭৬৬	ময়মনসিংহ	১০০৮৮
ত্রিপুরা	১৩৫২৭	চট্টগ্রাম	৪৯২৫
নোয়াখালি	৮৭১৪		

কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তীস্থান। ২৭৭৪

উপসংহার।

প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র হইতে আধুনিক শাস্ত্র পর্য্যন্ত এবং আর্য্যসমাজের আদিম অবস্থা হইতে বর্ত্তমানকালীন অবস্থা পর্য্যন্তের আলোচনা দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে, জাতিভেদের প্রকৃত রহস্য কি? আরও জানা গিয়াছে, জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে পরবর্ত্তি-পণ্ডিতগণের কাল্পনিক মত অযুক্ত এবং শাস্ত্রসিদ্ধান্তের বহির্ভূত। সমস্ত ভারতীয় আর্য্যসমাজ চারিবর্ণে বিভক্ত। বঙ্গের বারুজীবী বা বারুইজাতি বৈশ্য। এ সকল বিষয়ে যতদূর সম্ভব শাস্ত্রযুক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। অধুনা উপসংহারে বঙ্গের বারুজীবী জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলি, ভ্রাতৃগণ! তোমরা শূদ্র নহ, তোমাদের ধমনীতে বিশুদ্ধ বৈশ্যশোণিত চিরপ্রবহমান। কালের কুটিলগতিতে স্বার্থপর

অজ্ঞ জনগণের নিকট তোমরা যদিও 'শূদ্র' নামে অভিহিত হও, তাহাতে করুণাময় পরমেশ্বরের অভিসন্ধিতে দোষারোপ করিও না। তোমরা যে কিছু হারাইয়াছ, সন্দেহ নাই। যদিও তোমরা পুরাকালের মত শৌচ-সদাচার ও সদ্‌গুণসম্পন্ন, তথাপি তোমরা জ্ঞানচর্চা হইতে নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছ। নিজেদের অনবধানতার ফলে যে তোমরা এই দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহাতে সংশয় নাই। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম কর, পূর্ব্বপুরুষগণের জ্ঞান-গরিমা ধ্যান কর। আত্মোন্নয়নে মনোনিবেশ কর। কেবল বৈশ্যবৃত্তিধারী না হইয়া বৈশ্যজ্ঞানাধিকারী হও। এই পবিত্র বৈশ্যকুলের নাভাগারিষ্ট-সুতদ্বয়, জ্ঞানবলে উচ্চতম ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তোমরা কি স্ববর্ণোচিত স্বধর্ম্মোচিত জ্ঞানানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া কেবল কৃষিবাণিজ্যে জীবন কাটাইবে? আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, জড়তা পরিহার পূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রদর্শিত পথে পদচারণে প্রবৃত্ত হও। তোমরা অধঃপতিত বঙ্গীয়-সমাজে আদর্শস্থানীয় হইতে পারিবে। ওঁ শান্তিঃ।

সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

———:•:———

সমাপ্ত।